অনাসক্তিযোগ

(শ্রীমদ্ভগবদগীতার অনুবাদ)

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

তরুণ সাহিত্য মন্দির,
১৬, গোবিন্দ সেন লেন,
কলিকাতা

অনুবাদক—
বিনয়কৃষ্ণ সেন

প্রকাশক--
বিজয়রত্ন সেন

চৈত্র, ১৩৩৭

প্রবাসী প্রেস,
১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা
শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত

অনুবাদকের কলিকাতা।

আইন অমান্য আন্দোলন উপলক্ষে দমদম স্পেশাল জেলে কিছুদিন বন্দীরূপে বাস করার সুবিধা পাইয়াছিলাম। তখন গান্ধীজীর গীতাভাষ্য অনাসক্তিযোগের বাংলা অনুবাদ করি। অনুবাদকালে গুজরাতীভাষাভিজ্ঞ মহাত্মাজীর ভক্ত কৃষ্ণদাসজীর কিছু সাহায্য পাই। বাহিরে আসার পর বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ পুস্তকটির উৎকর্ষসাধনের জন্য বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছেন। উভয়ের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

কলিকাতা

বিনয়কৃষ্ণ সেন

নিবেদন

গীতা পাঠ মনন ও তার অনুসরণ আজ চল্লিশ বৎসরের উপর হইতে করিতেছি। মিত্রগণ ইচ্ছা করিলেন যে, আমি যেভাবে ইহা বুঝিয়াছি তাহা যেন গুজরাতবাসীর নিকট প্রচার করি। আমি ইহার অনুবাদ করিয়াছি। বিদ্বানের দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, অনুবাদ করার যোগ্যতা আমার কিছুই নাই কহিতে হইবে। আচরণের দৃষ্টিতে দেখিলে আমার যোগ্যতা ঠিক ঠিক আছে বলা চলে। এই অনুবাদ এখন ছাপা হইয়াছে। অনেক গীতার সাথে সংস্কৃতও থাকে—ইহাতে ইচ্ছা করিয়া সংস্কৃত রাখি নাই। সকলে সংস্কৃত জানিলে বেশ হইত। কিন্তু সকলে কখনও সংস্কৃত জানিবে না। আর এক কথা, সংস্কৃতে তো বহুত সস্তা সংস্করণ পাওয়া যায়। এজন্য সংস্কৃত বাদ দিয়া বইএর

আকার ও দাম কমান স্থির করা হয়। আমার এরূপ ইচ্ছা যে, প্রত্যেক গুজরাতবাসী এই গীতা পড়ে চিন্তা করে এবং এই অনুসারে চলে। সংস্কৃতের খেয়াল না করিয়া ইহা হইতে অর্থ করার চেষ্টা করা ও তাহা কাজে পরিণত করাই ইহা চিন্তা করার সহজ উপায়। যথা, যে ব্যক্তি এরূপ অর্থ করে যে, গীতা স্বজন-পরজনের ভেদ না রাখিয়া দুষ্টের সংহার করা শিক্ষা দেয়, তাহার নিজের দুষ্ট মা-বাপ অথবা অপর প্রিয়জনের সংহার কাজে লাগিয়া যাওয়া উচিত। সে এরূপ করিতে তো পারেই না; তবে সংহার করার যে কথা আসে, তাহা অপর কোনো প্রকারের সংহার হওয়া সম্ভব, ইহা সহজ ভাবে যে পড়িবে তাহার মনে আসিবে। স্বজন-পরজনের ভেদ না রাখার কথা তো গীতার পাতায় পাতায় আছে। ইহা কিপ্রকারে হইতে পারে? ইহা

ভাবিতে ভাবিতে আমি এই অর্থে পৌঁছিয়াছি যে, গীতার বক্তব্য এই যে, অনাসক্তির সহিত সব কাজ করা চাই। কারণ প্রথম অধ্যায়েই অর্জ্জুনের সম্মুখে স্বজন-পরজনের ভেদ উপস্থিত হইয়াছে। এরূপ ভেদ মিথ্যা ও হানিকর ইহা গীতার প্রত্যেক. অধ্যায়ে নিরূপণ করা আছে। আমি গীতার নাম অনাসক্তিযোগ দিয়াছি। ইহা কি, ইহা কি প্রকারে শিখা যাইতে পারে, অনাসক্তির লক্ষণ কি, এই সকল বিষয় উপরোক্ত পুস্তক হইতে জানিতে ইচ্ছুক লোকে জানিতে পারিবে। গীতার অনুকরণ করিতে গিয়া আমি এই যুদ্ধ সুরু না করিয়া পারি নাই। এক মিত্র টেলিগ্রাফ করিয়াছেন—তদনুসারে বর্ত্তমান আন্দোলন আমার পক্ষে ধর্ম্মযুদ্ধ। আর তাহার ঠিক চূড়ান্ত মীমাংসার সময় এই পুস্তক বাহির হইল, ইহা আমার পক্ষে শুভ চিহ্ন।

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

সূচী

প্রস্তাবনা

স্বামী আনন্দ প্রভৃতি বন্ধুদের ভালবাসার খাতিরে আমি সত্যের প্রয়োগ বা আত্মকথা লেখা সুরু করিয়াছিলাম। একই কারণে গীতার অনুবাদ করিলাম। অসহযোগ আন্দোলনের সময় স্বামী আনন্দ আমাকে বলিয়াছিলেন, "আপনি যদি সমস্ত গীতার অনুবাদ করিয়া তার উপর প্রয়োজন মত টীকা করেন, তবে আমরা আপনার সেই সম্পূর্ণ অনুবাদ ও টীকা পড়িয়া আপনি গীতার যে অর্থ করেন তাহা বুঝিতে পারিব। এখান ওখান হইতে গীতার শ্লোক তুলিয়া আপনি যে অহিংসার সমর্থন করেন, ইহা তো আমাদের নিকট সঙ্গত বোধ হয় না।" আমার মনে হইয়াছিল কথাটা ঠিক। তখন জবাব দিয়াছিলাম, অবসর মিলিলে করিব। পরে জেলে যাই। সেখানে

বিশেষভাবে গীতাপাঠের সুবিধা হইল। লোক-মান্য তিলকের জ্ঞানভাণ্ডার গীতা-রহস্য পড়িলাম। তিনিই পূর্ব্বে আমাকে গীতার মারাঠী, হিন্দী ও গুজরাতী অনুবাদ প্রীতির সহিত পাঠান এবং মারাঠী পড়িতে সক্ষম না হইলে গুজরাতী যেন অবশ্য পড়ি এই অনুরোধ করেন। জেলের বাহিরে পড়ার সুবিধা হয় নাই; জেলে গুজরাতী অনুবাদ পড়ি। পড়িয়া গীতা সম্বন্ধে আরও বই পড়ার ইচ্ছা হয় এবং এই সম্বন্ধীয় অনেক বই উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখি।

সন ১৮৮৮--৮৯ খৃষ্টাব্দে এডুয়িন আর্নল্ডের গীতার পদ্যানুবাদ পাঠ করিয়া গীতার সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। ইহার ফলে গুজরাতী অনুবাদ পড়ার তীব্র ইচ্ছা জন্মে এবং যত অনুবাদ হাতে পড়ে সে সব পড়ি। পরন্তু এরূপ পাঠ করিয়াছি বলিয়াই গীতার অনুবাদ করিয়া তাহা

জনসমাজের সম্মুখে উপস্থিত করার অধিকার আমার জন্মে নাই। আর এক কথা আমার সংস্কৃত জ্ঞান অল্প এবং গুজরাতী-ভাষা-জ্ঞান হিসাবেও আমি পণ্ডিত নহি। তবে অনুবাদ করার ধৃষ্টতা আমার কেন হইল?

গীতাকে যে-ভাবে বুঝিয়াছি সেই অনুযায়ী আচরণ করিতে আমার কয়েকজন সাথী ও আমি সতত সচেষ্ট আছি। গীতা আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের নিদান-গ্রন্থ। এইরূপ আচরণ করিবার চেষ্টা নিত্যই কতরূপে ব্যর্থ হইতেছে; প্রযত্ন সত্ত্বে এই ব্যর্থতা এড়াইতে পারিতেছি না—কিন্তু এই ব্যর্থতার ভিতরই সফলতার উদীয়মান কিরণের ঝলক দেখা দিতেছে। আমাদের এই ছোট দলটি গীতার যে অর্থ গ্রহণ করিয়া তদনুযায়ী আচরণ করিতে চেষ্টা করিতেছে, এই অনুবাদে সেই অর্থই দেওয়া হইল।

ইহা ভিন্ন স্ত্রীলোক, বৈশ্য ও শূদ্রের ভিতর যাহারা অল্প লেখাপড়া জানে, মূল সংস্কৃতে গীতা বুঝার সময় অথবা ইচ্ছা যাহাদের নাই, অথচ যাহাদের গীতার আশ্রয় লইবার প্রয়োজন আছে, তাহাদের জন্য এই অনুবাদ। গুজরাতী ভাষায় আমার জ্ঞান কম হইলেও, আমার যে-কিছু পুঁজি আছে, তাহা এই ভাষার সাহায্যেই আমি গুজরাতবাসীদিগকে দিবার জন্য সর্ব্বদা অত্যন্ত উৎসুক। কুরুচি-পূর্ণ সাহিত্যের প্রভাব বর্ত্তমানে অত্যন্ত প্রবল। এ সময় হিন্দুধর্ম্মে যাহাকে অদ্বিতীয় গ্রন্থ বলা হয়, সেই গ্রন্থের সরল অনুবাদ সকলে পড়িতে পায় এবং তাহা হইতে উক্ত সাহিত্যের প্রভাব প্রতিরোধ করার শক্তিলাভ করে—ইহাই আমার ইচ্ছা।

কিন্তু তাই বলিয়া অন্যান্য গুজরাতী অনুবাদের প্রতি আমার কোন অবজ্ঞার ভাব নাই। এই সব

অনুবাদের মূল্য যাহাই থাকুক না কেন, অনুবাদকগণ গীতা-নির্দ্দিষ্ট পথে চলিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। গত আটত্রিশ্ বৎসর হইতে আমি গীতার পথে চলার জন্য চেষ্টা করিতেছি বলিয়া আমার এই অনুবাদের কিছু মূল্য আছে। এ জন্য আমার আন্তরিক ইচ্ছা, যেসব গুজরাতী ভাই-ভগ্নি ধর্ম্মপথে চলিতে ইচ্ছুক তাহারা ইহা পড়ে, মনন করে ও ইহা হইতে শক্তিলাভ করে।

এই অনুবাদের জন্য আমার সাথীরাও বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছেন। আমার সংস্কৃতজ্ঞান খুব অসম্পূর্ণ এবং শব্দের অর্থ সম্বন্ধে আমার পুরা বিশ্বাস না থাকায় এই অনুবাদ বিনোবা, কাকা কালেলকর, মহাদেব দেশাঈ এবং কিশোরলাল মশরুবালা দেখিয়া দিয়াছেন।

এখন গীতার অর্থ সম্বন্ধে বলিব।

১৮৮৮-৮৯ খৃষ্টাব্দে গীতার প্রথম দর্শন কালেই মনে হয় ইহা ঐতিহাসিক গ্রন্থ নহে, সাধারণ যুদ্ধ বর্ণনার ছলে প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ে নিরন্তর যে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ হইতেছে ইহা তাহারই বর্ণনা। এই অন্তর্যুদ্ধের বর্ণনা সরস করার জন্য ইহাতে মানব-যোদ্ধা কল্পনা করা হইয়াছে। এই ধারণাই ধর্ম্ম ও গীতা সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তা করার পর পাকা হইয়া গিয়াছে। মহাভারত পড়ার পর ইহা আরও দৃঢ় হইয়াছে। বর্ত্তমানে আমরা যেরূপ গ্রন্থকে ইতিহাস বলি আমার মতে মহাভারত সেরূপ গ্রন্থ নহে। ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আদি পর্ব্বেই আছে। গ্রন্থোক্ত পাত্রগণের অমানুষী ও অতি-মানুষী উৎপত্তির বর্ণনা করিয়া ব্যাসদেব রাজা-প্রজার ঐতিহাসিকত্ব ধুইয়া ফেলিয়াছেন। মহাভারতে বর্ণিত পাত্রগণ ঐতিহাসিক হইতে পারেন, কিন্তু মহাভারতে

ব্যাসদেব কেবল ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝানর জন্য তাহাদের অবতারণা করিয়াছেন।

মহাভারতকার লৌকিক যুদ্ধের আবশ্যকতা প্রমাণ করেন নাই, বরং ইহার নিরর্থকতাই প্রমাণ করিয়াছেন। তিনি বিজেতাদের দ্বারা রোদন করাইয়াছেন, অনুতাপ করাইয়াছেন এবং তাহাদের জন্য দুঃখ বিনা আর কিছুই রাখেন নাই। এই মহাগ্রন্থে 'গীতা' শিরোমণিরূপে বিরাজ করিতেছে। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে লৌকিক যুদ্ধকৌশলের পরিবর্ত্তে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ শিখান হইয়াছে। আমার মনে হয় সাধারণ যুদ্ধের সহিত স্থিতপ্রজ্ঞের কোনো সম্বন্ধ নাই; স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ দেখিলেই ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। সামান্য পারিবারিক কলহের ঔচিত্য অনৌচিত্য নির্ণয় করার জন্য গীতার মত পুস্তক রচিত হয় নাই।

গীতার শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিমান শুদ্ধ পূর্ণ জ্ঞান, পরন্তু

কাল্পনিক। এখানে কৃষ্ণ নামে অবতার-পুরুষকে অস্বীকার করা হইতেছে না; কেবল পূর্ণাবতার কৃষ্ণ কাল্পনিক; এই পূর্ণ অবতারত্ব পরে আরোপিত হইয়াছিল।

অবতারের অর্থ—শরীর-ধারী পুরুষ বিশেষ। জীবমাত্র ঈশ্বরের অবতার, পরন্তু লৌকিক ভাষায় আমরা সকলকে অবতার বলি না। যে পুরুষ স্বীয় যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মবান তাহাকে ভবিষ্যতের লোকে অবতার রূপে পূজা করে। ইহাতে আমি কোনো দোষ দেখি না; ইহা দ্বারা ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠত্ব ক্ষুণ্ণ করা অথবা সত্যকে আঘাত করা হয় না। 'আদম ঈশ্বর নয় কিন্তু আদম ঈশ্বরের জ্যোতি হইতে স্বতন্ত্র নয়।' ধর্ম্মের বিকাশ যে যুগে যাঁর ভিতর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তিনি সেই যুগের বিশেষ অবতার। এই হিসাবে শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণাবতার রূপে হিন্দু-জগতে পূজা পাইতেছেন।

অবতার কল্পনায় মানবাত্মার চরম প্রিয় অভিলাষ সূচিত হয়। ঈশ্বরের স্বরূপ না হওয়া পর্য্যন্ত মানুষের তৃপ্তিলাভ হয় না, শান্তি হয় না। ঈশ্বররূপ হওয়ার চেষ্টাই প্রকৃত ও একমাত্র পুরুষার্থ এবং ইহাই আত্মদর্শন। এই আত্মদর্শন যেমন সকল ধর্ম্মগ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় তেমনি গীতারও প্রতিপাদ্য বিষয়; পরন্তু ইহা প্রতিপন্ন করার জন্য গীতাকার গীতা রচনা করেন নাই। আত্মার্থীকে আত্মদর্শনের অদ্বিতীয় উপায় প্রদর্শন করাই গীতার উদ্দেশ্য। যাহা হিন্দুধর্ম্ম-গ্রন্থে যেখানে সেখানে দেখা যায়, তাহাকে গীতাকার অনেক প্রকারে অনেক কথায়, পুনরুক্তি দোষ স্বীকার করিয়াও সুন্দরভাবে প্রমাণ করিয়াছেন।

কর্ম্মফলত্যাগই এই অদ্বিতীয় উপায়। ইহাকে মধ্যস্থলে রাখিয়া তাহার চারিদিকে গীতার অন্যান্য বিষয়গুলি সজ্জিত করা হইয়াছে। ভক্তি জ্ঞান

ইত্যাদি তার আশে-পাশে নক্ষত্রমণ্ডলীর ন্যায় শোভা পাইতেছে। যেখানে দেহ আছে সেখানে কর্ম্ম তো আছেই। কর্ম্ম হইতে কেহই মুক্ত নহে। তথাপি দেহকে ভগবানের মন্দির বানাইয়া তাহা দ্বারা মুক্তি পাওয়া যায়, ইহাই সকল ধর্ম্মের প্রতিপাদ্য। পরন্তু কর্ম্মমাত্রেরই কিছু না কিছু দোষ আছে। মুক্তি তো নির্দ্দোষীর হইয়া থাকে। তবে কর্ম্মবন্ধন অর্থাৎ দোষস্পর্শ হইতে কিরূপে মুক্ত হওয়া যায়? ইহার উত্তর গীতা নিশ্চয়াত্মক শব্দে দিয়াছে। "নিষ্কাম কর্ম্ম করিয়া, যজ্ঞার্থে কর্ম্ম করিয়া, কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া, সকল কর্ম্ম কৃষ্ণে অর্পণ করিয়া অর্থাৎ মন বচন ও শরীর ঈশ্বরে হোম করিয়া" কর্ম্ম করিলে কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়।

পরন্তু নিষ্কামতা, কর্ম্মফলত্যাগ শুধু মুখের কথায় আসে না। ইহা কেবল বুদ্ধির প্রয়োগ

নহে। ইহা হৃদয়মন্থন হইতেই উৎপন্ন হয়। এই ত্যাগ শক্তি উৎপন্ন করার জন্য জ্ঞান আবশ্যক। এক প্রকারের জ্ঞান তো বহু পণ্ডিত পাইয়া থাকেন। বেদাদি তাহাদের কণ্ঠে থাকে, পরন্তু তাহাদের অধিকাংশ ভোগাদিতে ডুবিয়া থাকেন। জ্ঞান যাহাতে শুষ্ক পাণ্ডিত্যে পর্য্যবষিত না হয়, সেজন্য গীতাকার জ্ঞানের সহিত ভক্তি মিলাইয়া সেই ভক্তিমিশ্রিত জ্ঞানকে প্রথম স্থান দিয়াছেন। ভক্তিহীন জ্ঞান কোনো কাজে আসে না। গীতাকার বলিয়াছেন, "ভক্তি কর তো জ্ঞান অবশ্যই মিলিবে ;" পরন্তু ভক্তি লাভ করা "তলোয়ারের ধারের উপর দিয়া চলার ন্যায় শক্ত।" সেজন্য গীতাকার ভক্তের লক্ষণ স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণের অনুরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অর্থাৎ গীতার ভক্তি নির্ব্বুদ্ধিতা বা অন্ধ শ্রদ্ধা নয়। গীতা-বর্ণিত ভক্তির সহিত বাহ্যিক ক্রিয়া-

কলাপের সম্বন্ধ নাই বলিলেই হয়। মালা, তিলক এবং অর্ঘ্যাদির ব্যবহার ভক্ত করিতে পারে, কিন্তু এসব ভক্তির লক্ষণ নহে। যে কাহারও দ্বেষ করে না, যে করুণার ভাণ্ডার, মমতারহিত নিরহঙ্কার, যার কাছে সুখ-দুঃখ শীত-উষ্ণ সমান, যে ক্ষমাশীল, যে সদা সন্তুষ্ট, যার সংকল্প কখনও টলে না, যে মন এবং বুদ্ধি ঈশ্বরে অর্পণ করিয়াছে, যাহা হইতে লোকে উদ্বিগ্ন হয় না, যে লোকের ভয় রাখে না, যে হর্ষ-শোক-ভয়াদি হইতে মুক্ত, যে পবিত্র, যে কার্য্যদক্ষ হইয়াও উদাসীন, যে শুভাশুভকে ত্যাগ করিয়াছে, যে শত্রুমিত্রের উপর সমভাব রাখে, যার নিকট মান অপমান সমান, যে স্তুতি দ্বারা স্ফীত এবং নিন্দা দ্বারা দুঃখিত হয় না, যে মৌনব্রতী, নির্জ্জনতাপ্রিয়, স্থিরবুদ্ধি, সে-ই ভক্ত। এই ভক্তির অধিকারী হওয়া আসক্ত স্ত্রী-পুরুষের পক্ষে সম্ভব নহে।

ইহা হইতে দেখিতেছি যে, জ্ঞান লাভ করাই, ভক্ত হওয়াই আত্মদর্শন। আত্মদর্শন ইহা ভিন্ন আর কিছু নহে। যেমন একটি টাকা দিয়া বিষও কেনা যায়. আবার অমৃতও কেনা যায়, সেইরূপ জ্ঞান কিংবা ভক্তি দ্বারা বন্ধন অথবা মোক্ষ উভয়ই পাওয়া যায় না। এখানে সাধন ও সাধ্য বিলকুল এক না হইলেও প্রায় একই বস্তু। সাধনের যাহা পরাকাষ্ঠা তাহাই মোক্ষ। আর গীতার মোক্ষের অর্থ পরম শান্তি।

এই প্রকারে জ্ঞান এবং ভক্তিকে কর্ম্মফলত্যাগের কষ্টি পাথরে কষিয়া দেখিতে হইবে। লৌকিক ধারণা অনুসারে শুষ্ক পণ্ডিতকেও জ্ঞানী বলা হয়। তাহার কোনো কাজ করিতে হয় না। লোটা পর্য্যন্ত উঠান তাহার পক্ষে কর্ম্মবন্ধন। যজ্ঞশূন্য ব্যক্তি যে স্থলে জ্ঞানীরূপে গণ্য হয়, সেখানে লোটা উঠানরূপ তুচ্ছ লৌকিক কাজের স্থান কিরূপে থাকিবে?

লৌকিক ধারণায় ভক্ত অর্থে নির্ব্বোধ মালাজপা লোক বুঝায়। সেবা করিলেও তাহার মালা জপা নষ্ট হয়। এ জন্য সে কেবল আহার প্রভৃতি শারীরিক ভোগ গ্রহণের সময় হাত হইতে মালা রাখিয়া দেয়, কখনও মালা ছাড়িয়া রোগীর সেবা শুশ্রূষা করিতে চায় না, অথবা জাতা ঘুরাইবার ন্যায় শারীরিক কাজ করিতে যায় না।

এই দুই শ্রেণীর লোককে গীতাকার স্পষ্টভাবে বলিয়া দিয়াছেন, "কর্ম্ম বিনা কেহই সিদ্ধি পায় নাই; জনক প্রভৃতিও কর্ম্মদ্বারাই জ্ঞানী হইয়াছিলেন। যদি আমিও আলস্যরহিত হইয়া কর্ম্ম না করিতে থাকি, তবে এই সৃষ্টির নাশ হইবে।" ইহার পর সাধারণ লোকের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবার আর কি থাকে?

পরন্তু একদিক হইতে কর্ম্মমাত্র যে বন্ধন-স্বরূপ তাহা নির্ব্বিবাদে স্বীকার করিতে হইবে। অপর

দিক হইতে দেহী ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক কর্ম্ম করিয়া যাইতেছে। শারীরিক কিংবা মানসিক চেষ্টা মাত্রই কর্ম্ম। তবে কর্ম্ম করিয়াও মানুষ কিরূপে বন্ধনমুক্ত রহে? এই সমস্যার মীমাংসা গীতায় যেরূপে করা হইয়াছে সেরূপে আর কোনো ধর্ম্মগ্রন্থে করা হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। গীতাকার বলিতেছেন:—"ফলাসক্তি ছাড় এবং কর্ম্ম কর," "আশারহিত হইয়া কর্ম্ম কর," "নিষ্কাম হইয়া কর্ম্মকর।" গীতার এসব উক্তি ভুল বুঝা যায় না। যে কর্ম্ম ত্যাগ করে, তার অধোগতি হয়। যে কর্ম্ম করার সহিত তার ফলত্যাগ করে, তার উর্দ্ধগতি হয়।

এখানে ফলত্যাগের অর্থ যেন কেহ এরূপ না করেন যে ত্যাগীর কোনো ফললাভ হয় না। গীতার কোথাও এরূপ অর্থের স্থান নাই। ফলত্যাগের অর্থ ফলবিষয়ে আসক্তির অভাব। বাস্তবপক্ষে

তো ফলত্যাগীর হাজারগুণ ফললাভ হয়। গীতার ফলত্যাগের ভিতর অক্ষুণ্ণ শ্রদ্ধার পরীক্ষা আছে। যে ব্যক্তি পরিণামের কথা চিন্তা করে, সে বহুবার কর্ম্ম অর্থাৎ কর্ত্তব্য 'ভ্রষ্ট হয়, তাহার অধীরতা আসে, ইহা হইতে সে ক্রোধের বশ হয় এবং তখন সে যাহা করা উচিত নয় এরূপ কাজ করিতে আরম্ভ করে, এক কর্ম্ম ছাড়িয়া দ্বিতীয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় এবং দ্বিতীয় কর্ম্ম ছাড়িয়া তৃতীয় কর্ম্মে জড়িত হইয়া পড়ে। পরিণাম-চিন্তাকারীর অবস্থা বিষয়ান্ধের মত হয়, শেষে সে-ও বিষয়ীর ন্যায় ভাল-মন্দ, নীতি-দুর্নীতির বিচার ত্যাগ করে এবং ফললাভের জন্য যে-কোনো উপায় অবলম্বন করে ও তাহাকেই ধর্ম্ম মনে করে।

ফলাসক্তির এই কু-পরিণাম দেখিয়া গীতাকার অনাসক্তি অর্থাৎ ফলত্যাগের সিদ্ধান্ত জগতের সম্মুখে অতি চিত্তাকর্ষক ভাষায় উপস্থিত করিয়াছেন।

সাধারণত লোকে মনে করে যে, “ধর্ম্ম ও অর্থ পরস্পর-বিরোধী বস্তু, ব্যবসায় প্রভৃতি লৌকিক ব্যাপারে ধর্ম্মপালন করা সম্ভব নয়, ধর্ম্মের স্থান সেখানে নাই, ধর্ম্মের অনুষ্ঠান কেবল মোক্ষের জন্যই করিতে হয়। ধর্ম্মের স্থানে ধর্ম্ম এবং অর্থের স্থানে অর্থ শোভা পায়।” আমার মতে গীতাকার এই ভুল ধারণা দূর করিয়াছেন। গীতাকার মোক্ষ এবং লৌকিক ব্যবহারের ভিতর এরূপ ভেদ রাখেন নাই। বরং ব্যবহারিক জগতেও ধর্ম্মকে আসন দিয়াছেন। যে ধর্ম্ম ব্যবহার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না তাহা ধর্ম্ম নহে, আমার মতে গীতায় এই শিক্ষা দিতেছে। অর্থাৎ যে-সব কর্ম্ম আসক্তিবিনা করা সম্ভব নহে, গীতার মতে সে সমস্তই ত্যজ্য। এই সুবর্ণ নিয়ম মানুষকে অনেক ধর্ম্মসঙ্কট হইতে বাঁচায়। এই মত অনুসারে, খুন, মিথ্যা, ব্যভিচার

প্রভৃতি কাজ সহজেই ত্যজ্য হইয়া পড়ে, মানব-জীবন সরল হয় এবং সরলতা হইতে শান্তির উদ্ভব হয়। ফলত্যাগের অর্থ পরিণাম সম্বন্ধে বেপরোয়া হওয়াও নহে। কর্ম্মের পরিণাম এবং কার্য্যসাধন প্রণালী সম্বন্ধে চিন্তা ও জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক। এ গুলি থাকার পর যে ব্যক্তি ফলাকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া কার্য্যসাধনে তন্ময় থাকে সে-ই ফলত্যাগী।

এই ধারায় চিন্তা করিতে করিতে আমার মনে হয় যে, গীতার শিক্ষা কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে স্বভাবত সত্য ও অহিংসা পালন করিতে হয়। ফলাসক্তি না থাকিলে মানুষের অসত্য বলার অথবা হিংসা করার লালসা থাকে না। যে-কোনো অসত্য অথবা হিংসামূলক কার্য্য আলোচনা করিলেই দেখিতে পাইব যে, ইহার পিছনে নিশ্চয়ই ফলাকাঙ্খা আছে। পরন্তু

অহিংসানীতি গীতার প্রতিপাদ্য বিষয় নহে। গীতা যুগের পূর্ব্বেও অহিংসাকে পরম ধর্ম্ম মনে করা হইত। অনাসক্তিবাদই গীতার প্রতিপাদ্য বিষয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইহা স্পষ্ট হইয়াছে।

কিন্তু অহিংসানীতিই যদি গীতার প্রতিপাদ্য বিষয় হইত, অথবা অনাসক্তি হইতে অহিংসাভাব যদি স্বভাবত আসে, তবে গীতাকার লৌকিক যুদ্ধকে কেন উদাহরণ রূপে গ্রহণ করিলেন? গীতা-যুগে লোকে অহিংসা-ধর্ম্মের মর্য্যাদা বুঝিলেও যুদ্ধ-বিগ্রহ সাধারণ ব্যাপার ছিল বলিয়া গীতাকারের পক্ষে ঐরূপ যুদ্ধের উদাহরণ গ্রহণ করায় সঙ্কোচ হয় নাই, হইতেও পারে না।

পরন্তু ফলত্যাগের মহত্ত্ব আলোচনা করিতে গিয়া গীতাকারের মনে কি ধারণা ছিল, তিনি অহিংসার মর্য্যাদার সীমা কি ভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা আমাদের বিচার করার

আবশ্যক নাই। কবি মহত্ত্বের আদর্শ জগতের সম্মুখে উপস্থিত করেন; ইহা হইতে একথা বুঝা যায় না যে, তিনি সর্ব্বদা আপনার আদর্শের মহত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে জানেন অথবা জানার পর তাহাকে পূর্ণরূপে ভাষায় প্রকাশ করিতে সক্ষম। ইহাতেই কবির ও কাব্যের মহিমা। কবির অর্থের অন্ত নাই। মানুষের ন্যায় মহাবাক্যের অর্থেরও বিকাশ হইতে থাকে। ভাষার ইতিহাস আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, অনেক মহান শব্দের অর্থ নিত্য নূতন হইতেছে। এই কথা গীতার অর্থ সম্বন্ধেও খাটে। গীতাকার নিজেই মহত্ত্বপূর্ণ কঠিন শব্দ সকলের অর্থের বিস্তার করিয়াছেন। গীতার যেখানে-সেখানে পড়িলেই এ কথা বুঝা যাইবে। গীতা-যুগের পূর্ব্বে সম্ভবত যজ্ঞে পশুহিংসা প্রচলিত ছিল; কিন্তু গীতার যজ্ঞে তাহার কোনো গন্ধ পর্য্যন্ত নাই। গীতায় যপ-যজ্ঞকে

যজ্ঞ-শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। তৃতায় অধ্যায়ে আছে, যজ্ঞের অর্থ প্রধানত পরোপকারার্থে শরীরের নিয়োগ। তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায় একত্র করিয়া অন্য ব্যাখ্যাও করা যাইতে পারে; কিন্তু যজ্ঞের অর্থ যে পশুহিংসা তাহা কোনো মতে করা যায় না। গীতার সন্ন্যাসের অর্থ সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। কর্ম্মমাত্রের ত্যাগকে গীতার সন্ন্যাস বলা হয় না। গীতার সন্ন্যাসী অতি কর্ম্মী হইয়াও অতি অকর্ম্মী। এইরূপে গীতাকার মহান শব্দ সমূহের ব্যাপক অর্থ করিয়া আপনার ভাষার ব্যাপক অর্থ করা আমাদিগকে শিখাইয়াছেন। গীতাকারের ভাষার অক্ষরে অক্ষরে মানে করিয়া বুঝান যায় যে, সম্পূর্ণ ফলত্যাগীর দ্বারা লৌকিক যুদ্ধ হইতে পারে। পরন্তু গীতার শিক্ষাকে পূর্ণরূপে কার্য্যে পরিণত করার জন্য প্রায় চল্লিশ বৎসর ধরিয়া সতত চেষ্টা করার পর আমার যে ধারণা হইয়াছে সে ধারণা

হইতে নম্রভাবে কহিতেছি যে, সত্য ও অহিংসা সম্পূর্ণরূপে পালন না করিলে, সম্পূর্ণ কর্ম্মফলত্যাগ মানুষের পক্ষে অসম্ভব।

গীতা সূত্র-গ্রন্থ নহে। গীতা এক মহান ধর্ম্ম কাব্য। ইহার ভিতর যত গভীর ভাবে প্রবেশ করিবে, তত নূতন ও সুন্দর অর্থ পাইবে। গীতা জনসমাজের জন্য, ইহাতে একই কথা অনেক প্রকারে কহা আছে। এজন্য গীতার মহা শব্দ-গুলির অর্থ যুগে যুগে বদলাইবে ও বিস্তৃত হইবে। গীতার মূলমন্ত্র কখনও পরিবর্ত্তিত হইবে না। ঐ মন্ত্র যে রীতিতে সাধন করা সম্ভব, জিজ্ঞাসু অধিকার অনুসারে তদনুরূপ অর্থ করিয়া লইতে পারে।

গীতা বিধি-নিষেধ গ্রন্থ নহে। একের পক্ষে যাহা বিহিত, তাহাই অপরের পক্ষে নিষিদ্ধ হইতে পারে। এককালে বা একদেশে যাহা বিহিত,

তাহা অপর কালের বা দেশের পক্ষে নিষিদ্ধ হইতে পারে। মাত্র ফলাসক্তি নিষিদ্ধ, আর অনাসক্তি বিহিত।

গীতায় জ্ঞানের মহিমা স্বীকার করা হইয়াছে; তথাপি গীতা বুদ্ধিগম্য নহে, ইহা হৃদয়গম্য। এজন্য ইহা অশ্রদ্ধাবানের জন্য নহে। গীতাকার বলিয়াছেন—

"যে তপস্বী নহে, যে ভক্ত নহে, যে শুনিতে চায় না, আর যে আমার দ্বেষ করে, তাহাকে তুমি এই (জ্ঞানের) কথা কখনও কহিবে না। (১৮-৬৭)

"পরন্তু এই পরম গুহ্য জ্ঞান যে আমার ভক্তকে দেয়, আমার প্রতি পরম ভক্তির জন্য সে নিঃসন্দেহ আমাকে পাইবে। (১৮-৬৮)

"যে ব্যক্তি দ্বেষরহিত হইয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শুধু শুনিবে, সেও মুক্ত হইয়া পুন্যবান লোকে যেখানে বাস করে সেই শুভ লোক প্রাপ্ত হইবে।" (১৮-৭১)

কৌসানী (হিমালয়)
২৪-৬-২৯

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

প্রথম অধ্যায়

অর্জ্জুন-বিষাদ-যোগ

জিজ্ঞাসা বিনা জ্ঞান হয় না। দুঃখ বিনা সুখ হয় না। ধর্ম্ম-সঙ্কট—হৃদয়-মন্থন সব জিজ্ঞাসুরই একবার হইয়া থাকে।

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন—

হে সঞ্জয়! আমাকে বল ধর্ম্মক্ষেত্র রূপ কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করিবার ইচ্ছায় সমবেত আমার এবং পাণ্ডুর পুত্রগণ কি করিল? ১

টিপ্পনী—এই শরীররূপী ক্ষেত্র ধর্ম্মক্ষেত্র, কারণ ইহা মোক্ষের দ্বার হইতে পারে। পাপ হইতে ইহার উৎপত্তি এবং ইহা পাপেরই ভাজন হইয়া বর্ত্তমান থাকে, এজন্য ইহা কুরুক্ষেত্র।

কৌরবের অর্থ আসুরী প্রবৃত্তি এবং পাণ্ডুপুত্রের অর্থ দৈবী প্রবৃত্তি। প্রত্যেক শরীরে ভাল এবং মন্দ প্রবৃত্তির যুদ্ধ চলিতেছে, ইহা কে না অনুভব করেন ?

সঞ্জয় কহিলেন—

ঐ সময় পাণ্ডবদিগের সেনা সজ্জিত দেখিয়া রাজা দুর্য্যোধন আচার্য্য দ্রোণের কাছে গিয়া বলিলেন— ২

হে আচার্য্য ! আপনার বুদ্ধিমান শিষ্য দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্বারা সাজান পাণ্ডবদের এই বিরাট সেনাদল দেখুন। ৩

ইহার ভিতর ভীম অর্জ্জুনের ন্যায় মহাযোদ্ধা ধনুর্দ্ধারী, যুযুধান (সাত্যকি), বিরাট ও মহারথী দ্রুপদ রাজা, ৪

ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, বীর্য্যবান কাশীরাজ,

পুরুজিৎ, কুন্তীভোজ এবং নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য, ৫

এই প্রকার পরাক্রমী যুধামন্যু বলবান উত্তমৌজা, সুভদ্রাপুত্র অভিমন্যু এবং দ্রৌপদীর পুত্রগণ—এই সব মহারথী আছেন। ৬

হে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ! এখন আমাদের পক্ষে যাহারা মুখ্য যোদ্ধা তাহাদিগকে জানিয়া রাখুন। আমাদের সেনা-নায়কদের নাম আপনার জানার জন্য বলিতেছি। ৭

এক তো আপনি, ভীষ্ম, কর্ণ, যুদ্ধজয়ী কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ এবং সোমদত্তের পুত্র ভূরিশ্রবা। ৮

ইহারা ভিন্ন নানাপ্রকার শস্ত্রচালনায় নিপুণ আরও অনেক যোদ্ধা আছেন।

ইহারা আমার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত এবং সকলেই যুদ্ধকুশল। ৯

ভীষ্ম দ্বারা রক্ষিত আমাদের সেনার বল অপ্রচুর, পরন্তু ভীম দ্বারা রক্ষিত উহাদের সেনার বল যথেষ্ট। ১০

সুতরাং আপনারা সকলে নিজ নিজ স্থানে বিভিন্ন ব্যূহপ্রবেশ পথে রহিয়া, পিতামহ ভীষ্মকে ভাল ভাবে রক্ষা করুন। (দুর্যোধন এই প্রকার বলিলেন।) ১১

তাহার হর্ষ বিধানের জন্য কুরুবৃদ্ধ প্রতাপশালী পিতামহ উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ করিয়া শঙ্খ বাজাইলেন। ১২

তখনই অনেক শঙ্খ, নাগরা, ঢোল, মৃদঙ্গ এবং রণশিঙা বা রণভেরী এক সাথে বাজিয়া ভয়ঙ্কর শব্দ হইল। ১৩

এই সময় শ্বেত অশ্বযুক্ত বড় রথে বসিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন দিব্য শঙ্খ বাজাইলেন। ১৪

শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজাইলেন। ধনঞ্জয় দেবদত্ত শঙ্খ বাজাইলেন। ভয়ানক কর্ম্মী ভীম পৌণ্ড্র নামক শঙ্খ বাজাইলেন। ১৫

কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয়, নকুল সুঘোষ এবং সহদেব মণিপুষ্পক নামক শঙ্খ বাজাইলেন। ১৬

মহাধনুর্দ্ধর কাশীরাজ, মহারথী শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাটরাজ, অজেয় সাত্যকি, ১৭

দ্রুপদরাজ, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, সুভদ্রাপুত্র মহাবাহু অভিমন্যু প্রভৃতি সকলেই, হে রাজন! আপন আপন শঙ্খ বাজাইলেন। ১৮

পৃথিবী এবং আকাশ কাঁপাইয়া ঐ ভয়ঙ্কর শব্দ কৌরবদিগের হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া দিল। ১৯

হে রাজন! ইহার পর কপিধ্বজ অর্জ্জুন কৌরবদিগকে সজ্জিত দেখিয়া হাতিয়ার চালাইতে উদ্যত হইয়া ধনুক উঠাইয়া হৃষিকেশকে এই কথা কহিলেনঃ অর্জ্জুন বলিলেন, হে অচ্যুত! আমার রথ উভয় সেনার মধ্যে স্থাপন কর; ২০-২১

'যেন আমি যুদ্ধের কামনায় উপস্থিত লোকদিগকে দেখিতে পারি এবং এই সংগ্রামে কাহার সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে জানিতে পারি। ২২

এ যুদ্ধে দুর্ব্বুদ্ধি দুর্যোধনের হিত সাধন করিতে ইচ্ছুক হইয়া যাহারা মিলিত

হইয়াছে, তাহাদিগকে আমি দেখিতে চাই।
২৩

সঞ্জয় বলিলেন—

হে রাজন! অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা কহিলে, শ্রীকৃষ্ণ উভয় সেনাদলের মধ্যস্থলে সকল রাজা এবং ভীষ্ম দ্রোণের সম্মুখে উত্তম রথ দাঁড় করাইয়া কহিলেন—

'হে পার্থ! এই সমবেত কৌরবদিগকে দেখ। ২৪-২৫

অর্জ্জুন সেখানে উভয় সেনাদলের মধ্যে পিতৃব্য, পিতামহ, আচার্য্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র, শ্বশুর এবং যাবতীয় বন্ধুবান্ধবকে দেখিলেন। এই সব বান্ধবকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া খেদ উৎপন্ন হওয়ায় কুন্তী-পুত্র অর্জ্জুন ইহা বলিলেন। ২৬-২৭-২৮

অর্জ্জুন বলিলেন—

হে কৃষ্ণ! যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক সমবেত এই স্বজনদিগকে দেখিয়া আমার গাত্র শিথিল হইতেছে, মুখ শুকাইয়া যাইতেছে, শরীর কাঁপিতেছে ও রোমাঞ্চিত হইতেছে। ২৮-২৯

হাত হইতে গাণ্ডীব খসিয়া পড়িতেছে, গা যেন পুড়িতেছে। আমি আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতেছি না, কারণ আমার মাথা চক্রের ন্যায় ঘুরিতেছে। ৩০

ইহা ভিন্ন হে কেশব! আমি তো দুর্লক্ষণ দেখিতেছি। যুদ্ধে স্বজনদিগকে নিহত করিয়া কোনোরূপ কল্যাণ হইবে দেখিতেছি না। ৩১

উহাদিগকে হত্যা করিয়া বিজয় চাই না,

রাজ্য চাই না, সুখ চাই না। হে গোবিন্দ! রাজ্য, সুখভোগ অথবা জীবনে আমাদের কি প্রয়োজন? ৩২

যাহাদের জন্য রাজ্য, ভোগ এবং সুখ চাই সেই আচার্য্য, কাকা, পুত্র, পিতামহ, মামা, শ্বশুর, পৌত্র, শালা এবং অন্যান্য স্বজন জীবন ও ধনের আশা ছাড়িয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া আছেন। ৩৩-৩৪

ইহারা আমাদিগকে হত্যা করিলেও, অথবা আমাদের ত্রিলোকের রাজ্য লাভ হইলেও, হে মধুসূদন! আমি তাহাদের মারিতে চাই না। তবে এক টুকরা জমির জন্য কেন ইহাদিগকে হত্যা করিব? ৩৫

হে জনার্দ্দন! ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদিগকে হত্যা করিয়া কি আমাদের আনন্দ হইবে?

এই আততায়ীদিগকেও হত্যা করিলে আমাদের পাপ হইবে। ৩৬

অতএব হে মাধব! স্বজন ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রদিগকে মারা আমাদের উচিত নহে। স্বজনদিগকে হত্যা করিয়া কিরূপে সুখী হইব? ৩৭

লোভে তাহাদের চিত্ত মলিন হইয়া গিয়াছে বলিয়া, তাহারা কুলনাশকৃতদোষ এবং মিত্রদ্রোহের পাপ দেখিতে পাইতেছে না। কিন্তু হে মধুসূদন! কুলনাশজনিত দোষ দেখিয়াও আমরা কেন এই পাপ হইতে নিবৃত্ত হইব না? ৩৮-৩৯

কুলক্ষয় হইলে সনাতন কুলধর্ম্ম নাশ হয়, এবং কুলধর্ম্ম নষ্ট হইলে অধর্ম্ম সমস্ত কুলকে ডুবাইয়া দেয়। ৪০

হে কৃষ্ণ! অধর্ম্মের বৃদ্ধি হইলে কুলস্ত্রীরা দূষিত হয় এবং তাহারা দূষিত হইলে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয়। ৪১

এই বর্ণসঙ্কর হইতে কুলঘাতক ও তাহার কুলের নরক বাস হয়; এবং পিণ্ডোদক ক্রিয়া হইতে বঞ্চিত হইয়া তাহার পিতৃ-পুরুষের অধোগতি হয়। ৪২

কুলঘাতকদের এই বর্ণসঙ্কর উৎপন্নকারী দোষে সনাতন জাতিধর্ম্ম ও কুলধর্ম্ম নাশ হয়। ৪৩

হে জনার্দ্দন! আমরা শুনিয়া আসিতেছি যে, যাহাদের কুলধর্ম্ম নাশ হয়, তাহাদের অবশ্যই নরকবাস হয়। ৪৪

হায়! কি দুঃখের কথা যে, আমরা মহাপাপ করার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি অর্থাৎ

রাজ্য-সুখের লোভে স্বজনদিগকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছি। ৪৫

অশস্ত্র ও যুদ্ধে পরাঙ্মুখ আমাকে যদি শস্ত্রধারী ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ রণে হত্যা করে, তবে তাহাতে আমার বহুত কল্যাণ হইবে। ৪৬

সঞ্জয় বলিলেন—

ইহা কহিয়া শোকে ব্যথিতচিত্ত হইয়া অর্জ্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে ধনুক-বান ত্যাগ করিয়া রথের পিছন দিকে বসিয়া পড়িলেন।

ওঁ তৎসৎ

এই প্রকারে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপ উপনিষদে অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যান্তর্গত যোগেশাস্ত্রের শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে অর্জ্জুন-বিষাদ যোগ নামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাংখ্যযোগ

মোহবশে মানুষ অধর্ম্মকে ধর্ম্ম মনে করে। মোহের জন্য অর্জ্জুন আপন পর ভেদ করিলেন। এই ভেদ মিথ্যা ইহা বলিতে গিয়া শ্রীকৃষ্ণ দেহ এবং আত্মার ভিন্নতা, দেহসকলের অনিত্যতা ও পৃথকত্ব তথা আত্মার নিত্যতা ও একত্ব সম্বন্ধে বলিয়াছেন। মানুষ কেবল পুরুষার্থের অধিকারী, ফলের নহে। এ জন্য নিজের কর্ত্তব্য স্থির করিয়া নিশ্চিন্তভাবে তাহাতে লাগিয়া থাকা চাই। এরূপ নিষ্ঠা থাকিলে লোকে মোক্ষ পাইতে পারে।

সঞ্জয় কহিলেন—

তখন করুণাকাতর, অশ্রুপূর্ণনয়ন বিষাদ-গ্রস্ত অর্জ্জুনকে মধুসূদন ইহা বলিলেন। ১

শ্রীভগবান কহিলেন—

হে অর্জ্জুন! এই বিষম সঙ্কট সময়ে

শ্রেষ্ঠ পুরুষের অযোগ্য স্বর্গরোধক অপযশকর এরূপ মোহ তোমার কেন আসিল? ২

হে পার্থ! তুমি কাতরভাবাপন্ন হইও না। ইহা তোমার শোভা পায় না। হৃদয়ের এই ক্ষুদ্র দৌর্ব্বল্য ত্যাগ করিয়া হে পরন্তপ! তুমি উঠ। ৩

অর্জ্জুন কহিলেন—

হে মধুসূদন! ভীষ্ম এবং দ্রোণকে রণভূমিতে বাণ দ্বারা কিরূপে আঘাত করিব? হে অরিসূদন ইঁহারা তো পূজনীয়। ৪

মহানুভব গুরুজনদিগকে হত্যা করা অপেক্ষা ইহলোকে ভিক্ষান্ন ভোজন করাও ভাল, কেননা গুরুজনকে বধ করিলে

আমাকে এই জগতেই তাঁহাদের রক্তমাখা অর্থ ও কামরূপ বিষয় সকল উপভোগ করিতে হইবে। ৫

এই যুদ্ধে জয় পরাজয়ের কোনটি আমাদের পক্ষে ভাল তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না। যাহাদিগকে হত্যা করিয়া আমরা জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করি না, সেই ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ সম্মুখে উপস্থিত রহিয়াছে। ৬

অজ্ঞানতাজনিত দুর্ব্বলতার জন্য আমার চিত্তবৃত্তি বিকল হইয়াছে, আমি কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়াছি। যাহাতে আমার হিত হইবে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলার জন্য তোমাকে অনুরোধ করিতেছি। আমি তোমার শিষ্য। তোমার শরণ লইলাম। আমাকে পথ বলিয়া দাও। ৭

ইহলোকে ধনধান্যসম্পন্ন নিষ্কণ্টক রাজ্য অথবা ইন্দ্রপদ মিলিলেও, তাহাতে আমার ইন্দ্রিয়সন্তপ্তকারী শোক দূর হইবে মনে হইতেছে না। ৮

সঞ্জয় কহিলেন—

শত্রুসন্তাপদাতা নিদ্রাজয়ী অর্জ্জুন হৃষিকেশ গোবিন্দকে, আমি যুদ্ধ করিব না, এই কথা কহিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। ৯

হে ভারত! তখন হৃষিকেশ উভয় সেনার মধ্যবর্ত্তী বিষাদগ্রস্ত অর্জ্জুনকে হাসিতে হাসিতে এই কথা বলিলেন। ১০

শ্রীভগবান বলিলেন—

যাহার জন্য শোক করা উচিত নয় তাহা লইয়া তুমি শোক করিতেছ অথচ পণ্ডিতের মত কথা বলিতেছ; কিন্তু

পণ্ডিতগণ মৃত বা জীবিত কাহারও জন্য শোক করেন না। ১১

কারণ বাস্তব পক্ষে দেখিতে গেলে এই সব রাজা, তুমি আমি যে কোনোকালে ছিলাম না অথবা ভবিষ্যতে থাকিব না তাহা নহে। ১২

দেহধারীর এই দেহে যেমন কৌমার, যৌবন ও জরা প্রাপ্তি হয়, তেমনি তাহার দেহান্তর প্রাপ্তিও হয়। এ বিষয়ে বুদ্ধিমান পুরুষের মোহ হয় না। ১৩

হে কৌন্তেয়! ইন্দ্রিয়গণের স্পর্শই শীত-উষ্ণ, সুখ ও দুঃখদায়ক; এ সব অনিত্য, এগুলি আসে আবার চলিয়া যায়; অতএব তুমি তাহাদিগকে সহ্য কর। ১৪

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! সুখদুঃখে সমভাবে

রহিতে সক্ষম যে বুদ্ধিমান লোককে এই শীতোষ্ণাদি বিষয় ব্যাকুল করিতে পারে না সে মোক্ষ পাওয়ার যোগ্য। ১৫

অসতের বা অনিত্য বস্তুর অস্তিত্ব নাই এবং সতের বা নিত্য বস্তুর নাশ নাই। এই উভয়ের স্বরূপ জ্ঞানীরা জানেন। ১৬

যাহা দ্বারা এই নিখিল জগত ব্যাপ্ত হইয়া আছে, তাহাকে তুমি অবিনাশী বলিয়া জানিও। কেহই এই অব্যয়কে নাশ করিতে সমর্থ হয় না। ১৭

নিত্যস্থায়ী অপরিমেয় ও অবিনাশী দেহীর এই দেহকে নশ্বর বলা হয়, অতএব হে ভারত! তুমি যুদ্ধ কর। ১৮

যে মনে করে যে ইহা (আত্মা) হত করে অথবা যে ভাবে ইহা নিহত হয়

তাহারা উভয়েই কিছু জানে না। আত্মা কাহাকেও হত করে না অথবা নিজেও হত হয় না। ১৯

ইহা (এই আত্মা) কখনও জন্মে না, মরে না, অথবা ইহা উৎপন্ন হইয়াছে বা ভবিষ্যতে থাকিবে না তাহাও নহে। অতএব ইহা জন্মশূন্য, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাতন; শরীর নাশের সহিত ইহার নাশ হয় না। ২০

হে পার্থ। যে আত্মাকে অবিনাশী, নিত্য, জন্মরহিত এবং অব্যয় মনে করে, সে কিরূপে কাহাকে হত্যা করে অথবা হত্যা করায়? ২১

লোকে যেরূপে পুরাণ কাপড় ত্যাগ করিয়া নূতন কাপড় পরে, ঐরূপে দেহধারী

জীর্ণ দেহকে ত্যাগ করিয়া অপর নূতন দেহ ধারণ করে। ২২

ইহাকে (আত্মাকে) শস্ত্রসমূহ ছেদন করিতে পারে না, আগুন পোড়াইতে পারে না, জল পচাইতে পারে না, বাতাস শুকাইতে পারে না। ২৩

ইহা কাটা যায় না, পোড়ান যায় না, পচান যায় না, শুকান যায় না। ইহা নিত্য, সর্ব্বব্যাপী, স্থির, অচল, এবং সনাতন। ২৪

আর ইহা ইন্দ্রিয় ও মনের অগোচর, বিকাররহিত; অতএব ইহাকে এইরূপ জানিয়া তোমার শোক করা উচিত নহে। ২৫

অথবা যদি মনে কর, ইহা নিত্য জন্মে

এবং নিত্য মরে, তথাপি হে মহাবাহো! তোমার শোক করা উচিত নহে। ২৬

যে জন্মে তাহার মৃত্যু এবং যে মরে তাহার জন্ম অনিবার্য্য। অতএব যাহা অনিবার্য্য তাহা শোক করার যোগ্য নহে। ২৭

হে ভারত! ভূতমাত্রের জন্মের পূর্ব্বের এবং মৃত্যুর পরের অবস্থা দেখা যায় না। উহা অব্যক্ত; মধ্যের অবস্থাই ব্যক্ত। তবে এবিষয়ে শোকের কারণ কি? ২৮

টিপ্পনী—ভূত অর্থাৎ স্থাবর জঙ্গম সৃষ্টি।

কেহ ইহাকে (আত্মাকে) আশ্চর্য্যবৎ দেখিয়া থাকে, কেহ ইহাকে আশ্চর্য্যরূপ বর্ণনা করিয়া থাকে, কেহ বা ইহা আশ্চর্য্য-ভাবে শুনিয়া থাকে, কেহ বা শুনিয়াও তাহাকে জানে না। ২৯

হে ভারত ! সকল দেহে অবস্থিত এই দেহী (আত্মা) নিত্য এবং কখনও নিহত হইতে পারে না ; এই হেতু তোমার কোনো কিছুর জন্য শোক করা উচিত নয়। ৩০

টিপ্পনী—এ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধিপ্রয়োগদ্বারা আত্মার নিত্যত্ব এবং দেহের অনিত্যত্ব বুঝাইয়া বলিয়াছেন যে, কোনো অবস্থায় দেহের নাশ করা উচিত মনে হইলে, স্বজন পরিজনের ভেদ মনে আনিয়া, কৌরব আত্মীয়, উহাদিগকে কিরূপে মারিব এরূপ চিন্তা করা মোহজনিত। ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম কি এখন অর্জ্জুনকে তাহাই বলিতেছেন।

স্বধর্ম্ম জানিয়াও তোমার কম্পিত হওয়া উচিত নয়, কারণ ধর্ম্মযুদ্ধের অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অধিক শ্রেয়স্কর আর কিছুই নাই। ৩১

হে পার্থ! অনায়াসপ্রাপ্ত মুক্ত স্বর্গ

দ্বারের ন্যায় এরূপ যুদ্ধ ভাগ্যবান ক্ষত্রিয়গণই লাভ করিয়া থাকে। ৩২

যদি এই ধর্ম্মযুদ্ধ না কর, তবে স্বধর্ম্ম ও কীর্ত্তি পরিত্যাগ হেতু তুমি পাপভাগী হইবে। ৩৩

সকলে নিরন্তর তোমার নিন্দা করিবে; এবং সম্মানিত পুরুষের পক্ষে অপযশ মৃত্যু অপেক্ষা খারাপ। ৩৪

যে সব মহারথী তোমাকে সম্মান করে, তুমি ভয়ে রণক্ষেত্র ত্যাগ করিয়াছ মনে করিয়া তাহারা তোমাকে তুচ্ছ করিবে। ৩৫

আর তোমার শত্রুরা তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করিবে এবং অনেক অকথ্য কথা কহিবে। ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখকর আর কি হইতে পারে? ৩৬

মরিলে তুমি স্বর্গে যাইবে, জিতিলে পৃথিবী ভোগ করিবে। অতএব হে কৌন্তেয়! যুদ্ধ করা স্থির করিয়া উঠ। ৩৭

টিপ্পনী—এই প্রকারে ভগবান আত্মার নিত্যত্ব এবং দেহের অনিত্যত্ব বুঝাইলেন এবং সহজপ্রাপ্ত যুদ্ধ করায় যে ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মে বাধা হয় না, তাহাও বলিলেন। অর্থাৎ ৩১ শ্লোকদ্বারা ভগবান পরমার্থের সহিত ব্যবহারিক জীবনের মিল ঘটাইলেন। তাহার পর তিনি একটি শ্লোক দ্বারা গীতার মুখ্য উপদেশের কথা উপস্থিত করিতেছেন।

সুখ-দুঃখ, লাভ-লোকসান, জয়-পরাজয়কে সমান ভাবিয়া যুদ্ধের জন্য তৈয়ার হও। ইহা করিলে তোমার পাপ হইবে না। ৩৮

আমি তোমাকে সাংখ্য সিদ্ধান্ত (তর্কবাদ) অনুসারে তোমার কর্ত্তব্য বুঝাইলাম।

এখন যোগবাদ অনুসারে বুঝাইতেছি শুন। ইহার আশ্রয় লইলে তুমি কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন করিতে পারিবে। ৩৯

ইহাতে (কর্ম্মযোগ মার্গে) আরম্ভের নাশ নাই, বিপরীত ফল দেখা দেয় না। এই ধর্ম্মের যৎকিঞ্চিৎ পালনও মহাভয় হইতে ত্রাণ করে। ৪০

হে কুরুনন্দন! যোগীর নিশ্চয়াত্মক বুদ্ধি একরূপ হইয়া থাকে, পরন্তু অস্থিরচিত্তের বুদ্ধি অনেক শাখাবিশিষ্ট এবং অনন্ত। ৪১

টিপ্পনী—যখন বুদ্ধি এক না থাকিয়া অনেক হয়, তখন উহা বাসনার রূপ ধারণ করে। এজন্য বুদ্ধি সমূহের অর্থ বাসনা।

অজ্ঞানী, বেদবাদী, যাহারা বলে 'ইহা ভিন্ন আর কিছু নাই', যাহারা কামনাপরায়ণ,

যাহারা স্বর্গকে শ্রেষ্ঠ মনে করে—ইহারা সকলে জন্মমৃত্যুফলপ্রসূ কর্ম্ম এবং ভোগৈশ্বর্য্য প্রাপ্তির জন্য অনুষ্ঠিত কর্ম্মের অতিরিক্ত প্রশংসা করিয়া থাকে। ভোগ ও ঐশ্বর্য্যে আসক্ত এই সব লোকের বুদ্ধি নষ্ট হইয়া যায়। ইহাদের বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মক হয় না, আর ইহারা সমাধিতে স্থির হইয়া থাকিতেও পারে না। ৪২-৪৩-৪৪

টিপ্পনী—যোগবাদের বিরোধী কর্ম্মকাণ্ড অথবা বেদবাদের বর্ণনা উপরোক্ত তিন শ্লোকে করা হইয়াছে। কর্ম্মকাণ্ড অথবা বেদবাদের অর্থ ফল উৎপন্ন করার জন্য অনুষ্ঠিত অসংখ্য ক্রিয়া। এই সব ক্রিয়া বেদের রহস্য হইতে, বেদান্ত হইতে স্বতন্ত্র এবং অল্পফলপ্রদ বলিয়া নিরর্থক।

হে অর্জ্জুন! বেদ ত্রিগুণাত্মক। ত্রিগুণ

হইতে তুমি অলিপ্ত থাক (অর্থাৎ নিষ্কাম হও), সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত হও। নিত্য সত্ত্বভাবস্থিত হও। কোন বস্তু লাভ করা বা তাহা রক্ষা করায় যত্নশূন্য হও, আত্মপরায়ণ হও। ৪৫

যে সব কাজ কূপ হইতে হয়, তাহা যেমন সরোবর হইতেও হয়, সেইরূপ যে সব জিনিষ বেদে আছে তাহা জ্ঞানবান ব্রহ্মপরায়ণ ব্যক্তি আত্মানুভূতি দ্বারাও পাইয়া থাকেন। ৪৬

কর্ম্মেই তোমার অধিকার, কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন ফলে কখনও অধিকার নাই। কর্ম্মের ফল যেন তোমার কাজে প্রবৃত্ত হওয়ার হেতু না হয়। কর্ম্ম না করার আগ্রহও যেন তোমার না হয়। ৪৭

হে ধনঞ্জয়! আসক্তি ত্যাগ করিয়া, যোগস্থ হইয়া অর্থাৎ সফলতা-নিষ্ফলতায় সমানভাবে থাকিয়া তুমি কর্ম্ম কর। সমতাকেই যোগ কহে। ৪৮

হে ধনঞ্জয়! সমত্ববুদ্ধির তুলনায় কেবল কর্ম্ম অনেক তুচ্ছ। তুমি সমত্ব-বুদ্ধির আশ্রয় লও। ফলের জন্য যে কাজ করে সে দয়ার পাত্র। ৪৯

বুদ্ধিযুক্ত অর্থাৎ সমত্বপ্রাপ্ত লোককে ইহলোকে পাপপুণ্য স্পর্শ করে না; অতএব তুমি সমত্বলাভের জন্য যত্ন কর। সমতাই কার্য্যকুশলতা। ৫০

কারণ সমত্ববুদ্ধিযুক্ত লোকে কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া জন্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয় এবং নিষ্কলঙ্ক গতি বা মোক্ষপদ পায়। ৫১

যখন তোমার বুদ্ধি মোহকলুষমুক্ত হইবে, তখন যে সব বিষয় শুনিয়াছ এবং যাহা শুনিতে বাকী আছে সে বিষয়ে তুমি উদাসীন হইবে। . . ৫২

নানা কথা শুনিয়া তোমার বুদ্ধি সংশয়াচ্ছন্ন হইয়াছে। ইহা যখন সমাধিতে স্থির হইবে, তখন তুমি সমত্বলাভ করিবে। ৫৩

অর্জ্জুন বলিলেন—

হে কেশব! স্থিতপ্রজ্ঞ অথবা সমাধিস্থের লক্ষণ কি? স্থিতপ্রজ্ঞ কি রীতিতে কথা বলে, বসে এবং চলে? ৫৪

শ্রীভগবান কহিলেন—

হে পার্থ! যখন মানুষ মনের সব কামনা ত্যাগ করে এবং আত্মাতেই আত্মাদ্বারা

সন্তুষ্ট রহে তখন তাহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যায়। ৫৫

টিপ্পনী—আত্মা দ্বারা আত্মাতে সন্তুষ্ট থাকা অর্থাৎ আত্মার আনন্দ ভিতর হইতে খোঁজা—সুখ-দুঃখদায়ী বাহিরের জিনিষের উপর আনন্দের আধার না রাখা। স্মরণ রাখা চাই—আনন্দ সুখ হইতে স্বতন্ত্র বস্তু। আমার পয়সা হইলে আমি সুখ মনে করি ইহা আমার মোহ। ভিখারী হইলেও, অন্নাভাবে দুঃখ হইলেও যদি আমি চুরি না করি, অথবা অপর কোনো প্রলোভনে না পড়ি, তবে ইহার ভিতর যে বস্তু আছে তাহা আমাকে আনন্দ দেয়, এবং উহাই আত্মসন্তোষ।

দুঃখে যে দুঃখী হয় না, যে সুখ ইচ্ছা করে না, আর যে রাগ-ভয় এবং ক্রোধ রহিত তাহাকে স্থিরবুদ্ধি মুনি বলে। ৫৬

সর্ব্ববিষয়ে আসক্তিরহিত হইয়া যে শুভ অথবা অশুভ প্রাপ্তিতে হৃষ্ট হয় না বা শোক করে না, তাহার বুদ্ধি স্থির। ৫৭

কচ্ছপ যেরূপে নিজের অঙ্গ সকল গুটাইয়া আনে, সেরূপে এই ব্যক্তি যখন ইন্দ্রিয়গণকে ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে সর্ব্বপ্রকারে প্রত্যাহার করে, তখন তাহার বুদ্ধি স্থির হইয়াছে বলা যায়। ৫৮

দেহধারী নিরাহারী থাকিলে বিষয় সকল তাহার নিকট হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে, কিন্তু রস (বিষয়তৃষ্ণা) যায় না ; ঐ রস ঈশ্বরদর্শন দ্বারা শান্ত হয়। ৫৯

টিপ্পনী—এই শ্লোকে উপবাস আদি নিষেধ করা হইতেছে না ; বরং তাহাদের মূল্য দেখান হইতেছে। বিষয় শান্ত করার জন্য উপবাসাদির

প্রয়োজন আছে, পরন্তু তাহার (বিষয়ের) মূল অর্থাৎ উহাতে যে রস (বাসনা) থাকে তাহা তো ঈশ্বর দর্শন হইলেই শান্ত হয়। যে ঈশ্বর সাক্ষাৎকারের রস-পায়; সে অপর রসের কথা ভুলিয়া যায়।

হে কৌন্তেয়! ইন্দ্রিয়গণ এরূপ প্রবল যে তাহারা প্রযত্নশীল বিবেকী পুরুষের মনকেও বলপূর্ব্বক হরণ করে। ৬০

এই সব ইন্দ্রিয়কে বশে রাখিয়া যোগী আমাতে তন্ময় হইয়া অবস্থান করিবে। কারণ নিজের ইন্দ্রিয় যার বশে থাকে, তার বুদ্ধি স্থির হয়। ৬১

টিপ্পনী—অর্থাৎ ভক্তি বিনা—ঈশ্বরের সহায় বিনা মানুষের প্রযত্ন মিথ্যা।

বিষয়ের চিন্তা করিতে করিতে লোকের

তাহাতে আসক্তি উৎপন্ন হয়, আসক্তি হইতে কামনা, এবং কামনা হইতে ক্রোধের উদয় হয়। ৬২

টিপ্পনী—কামনাকারীর ক্রোধ হওয়া অনিবার্য্য, কারণ কাম কখনও তৃপ্ত হয় না।

ক্রোধ হইতে মূঢ়তা উৎপন্ন হয়, মূঢ়তা হইতে স্মৃতিভ্রম হয়, স্মৃতিভ্রম হইতে জ্ঞান নষ্ট হয় এবং যাহার জ্ঞান নষ্ট হয় সে মৃততুল্য হয়। ৬৩

পরন্তু যাহার মন নিজের বশে থাকে, যাহার ইন্দ্রিয় রাগদ্বেষ রহিত হইয়া তাহার অধীন থাকে, সে ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা বিষয় ভোগ করিয়াও চিত্তের প্রসন্নতা লাভ করে। ৬৪

চিত্তের প্রসন্নতা হইতে তাহার সকল

দুঃখ দূর হয় এবং যাহার চিত্ত প্রসন্ন, তাহার বুদ্ধি শীঘ্রই স্থির হয়। ৬৫

যাহার সমত্ব নাই, তাহার বুদ্ধি নাই আত্মচিন্তা নাই। আর যাহার আত্মচিন্তা নাই, তাহার শান্তি নাই। যাহার শান্তি নাই, তাহার সুখ কোথা হইতে আসিবে? ৬৬

যাহার মন বিষয়-বিচরণশীল ইন্দ্রিয়ের পিছনে ধাবিত হয়, তাহার মন বায়ু যেমন নৌকাকে বিচালিত করে সেইরূপ তাহার প্রজ্ঞাকে হরণ করে। ৬৭

এজন্য হে মহাবাহো! যাহার ইন্দ্রিয়-গণ চারি দিকের বিষয়সমূহ হইতে নিবৃত্ত হইয়া নিজের বশে আসিয়াছে, তাহার বুদ্ধি স্থির হইয়াছে। ৬৮

যখন সকল প্রাণী ঘুমাইয়া থাকে তখন সংযমী লোকে জাগিয়া থাকে। যখন সাধারণ লোকে জাগিয়া থাকে, তখন জ্ঞানবান মুনি নিদ্রিত থাকে। ৬৯

টিপ্পনী—বিষয়ভোগী লোকে রাত্রি বারটা একটা পর্য্যন্ত নাচ-গান, রঙ্গ-তামাসা, খাওয়া-দাওয়া প্রভৃতি কাজে সময় কাটায় এবং প্রাতঃকালে সাতটা আটটা পর্য্যন্ত ঘুমায়। সংযমী মানুষ রাত্রি সাত আটটায় শুইয়া, মধ্য রাত্রিতে উঠিয়া ঈশ্বরের ধ্যান করে। আর এক কথা ভোগী সংসারের প্রপঞ্চ বাড়ায় এবং ঈশ্বরকে ভুলিয়া থাকে, কিন্তু সংযমী সাংসারিক প্রপঞ্চের কোন খবর রাখে না এবং ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার করে। এই শ্লোক দ্বারা ভগবান প্রকাশ করিলেন যে উভয়ের পথ স্বতন্ত্র।

নদী-সমূহের প্রবেশ দ্বারা পূর্ণ হইতে থাকিলেও সমুদ্র যেমন অচল থাকে,

সেইরূপ যাহার সংসারের ভোগ শান্ত হইয়াছে সে শান্তি পায়, যে-ব্যক্তি কামনা-পরায়ণ সে শান্তি পায় না। ৭০

সব কামনা ত্যাগ করিয়া যে পুরুষ ইচ্ছা, মমতা এবং অহঙ্কার-রহিত হইয়া বিচরণ করে, সে শান্তি পায়। ৭১

হে পার্থ! ঈশ্বরকে চিনিবার পথ এই-রূপ। এই পথ পাওয়ার পর কেহ মোহগ্রস্ত হয় না; এবং মরণ কালেও এরূপ অবস্থায় থাকিলে মানুষ ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। ৭২

ওঁ তৎসৎ

এই প্রকারে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপ উপনিষদ অর্থাৎ ব্রহ্ম-বিদ্যান্তর্গত যোগশাস্ত্রের শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে সাংখ্যযোগ নামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

তৃতীয় অধ্যায়

কর্ম্মযোগ

এই অধ্যায়কে গীতার স্বরূপ জানার চাবিকাঠি বলা যায়। ইহাতে কর্ম্ম কিরূপে করিতে হয়, কোন কর্ম্ম করা উচিত, সাচ্চা কর্ম্ম কি তাহা স্পষ্ট করা হইয়াছে। এখানে ইহাও বলা হইয়াছে যে, যথার্থ জ্ঞান পারমার্থিক কর্ম্মেই পরিণত হওয়া চাই।

র্জ্জুন কহিলেন—

হে জনার্দ্দন! যদি তুমি কর্ম্ম অপেক্ষা বুদ্ধিকে শ্রেষ্ঠ মনে কর, তবে হে কেশব! কেন আমাকে এই ঘোর কর্ম্মের জন্য প্রেরণা করিতেছ? ১

টিপ্পনী—বুদ্ধি অর্থাৎ সমত্ববুদ্ধি।

তোমার মিশ্রবাক্য দ্বারা আমার বুদ্ধিকে তুমি সংশয়াকুল করিয়া তুলিতেছ। অতএব যাহাতে আমার কল্যাণ হয় এরূপ একটি কথা আমাকে নিশ্চয় পূর্ব্বক বল। ২

টিপ্পনী—অর্জ্জুন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইতেছেন, কারণ এক দিকে ভগবান তাহার দুর্ব্বলতার জন্য তাহাকে দোষ দিতেছেন, এবং অপর দিকে দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪৯-৫০ শ্লোক দ্বারা কর্ম্মত্যাগের আভাস দিতেছেন। গভীর ভাবে চিন্তা করিলে বুঝা যায় যে, ঐ সব উক্তি প্রকৃত পক্ষে পরস্পরবিরোধী নহে—ভগবান এখন তাহাই বুঝাইতেছেন।

শ্রীভগবান কহিলেন—

হে পাপরহিত! ইহলোকে দুইপ্রকার অবস্থা (নিষ্ঠা) আছে তাহা পূর্ব্বে আমি বলিয়াছি। জ্ঞানযোগ দ্বারা সাংখ্যদের এবং কর্ম্মযোগ দ্বারা যোগীদের (নিষ্ঠা সাধিত হয়)। ৩

কর্ম্ম আরম্ভ না করিলেই পুরুষের নৈষ্কর্ম্ম্যলাভ হয় না এবং কর্ম্মের শুধু বাহ্য ত্যাগ দ্বারাই মোক্ষ পাওয়া যায় না। ৪

টিপ্পনী—নৈষ্কর্ম্ম্য অর্থাৎ মন বাক্য ও শরীর দ্বারা কর্ম্ম না করা। কাজ না করিলে এইরূপ নিষ্কামতার অনুভব কাহারও হয় না। তবে ইহার অনুভব কিরূপে হয় তাহা এখন দেখান হইবে।

বাস্তবিক কেহ ক্ষণকালও কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে না। প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন গুণসমূহ প্রত্যেক মানুষকে অবশ করিয়া তাহার দ্বারা কর্ম্ম করায়। ৫

যে ব্যক্তি কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল সংযত করে, অথচ ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয় মনে মনে চিন্তা করে সেই মূঢ়াত্মাকে মিথ্যাচারী কহে। ৬

টিপ্পনী—যথা যে ব্যক্তি কথা বন্ধ করে, কিন্তু মনে মনে কাহাকেও গালি দেয়, সে নিষ্কর্ম্মা নহে, পরন্তু মিথ্যাচারী। এই শ্লোকের অর্থ ইহা নহে যে, যতক্ষণ মনকে রোধ করা যাইবে না ততক্ষণ শরীরকে রোধ করা নিরর্থক। শরীরকে রোধ না করিলে মনের উপর আধিপত্য আসে না। পরন্তু শরীরকে সংযত করার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে মনকেও সংযত করিতে চেষ্টা করা আবশ্যক। যে লোক ভয় অথবা এইরূপ কোনো বাহ্য কারণে শরীরকে রোধ করে কিন্তু মনকে নিয়ন্ত্রিত করে না, অধিকন্তু মনের দ্বারা বিষয়ভোগ করে এবং সুযোগ পাইলে শরীর দ্বারাও ভোগ করে এরূপ মিথ্যাচারীর নিন্দা এখানে আছে। ইহার পরের শ্লোকে ইহার বিপরীত ভাব বর্ণনা করিতেছেন।

পরন্তু হে অর্জ্জুন। যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়

সমূহকে মন দ্বারা সংযত করিয়া সঙ্গরহিত (অনাসক্ত) হইয়া কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করে, সে শ্রেষ্ঠ পুরুষ। ৭

টিপ্পনী—এই শ্লোকে বাহির ও অন্তরের মিলন সাধিত হইয়াছে। মনকে সংযত রাখিলেও মানুষ শরীর দ্বারা অর্থাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কিছু না কিছু করিবেই। পরন্তু যার মন আয়ত্তাধীন আছে, তাহার কান দূষিত কথা না শুনিয়া ঈশ্বরভজন শুনিবে, সৎপুরুষের গুণ-গান শুনিবে। যাহার মন স্ববশে আছে, আমরা যাহাকে বিষয় বলি, সে তাহাতে রস পায় না। এইরূপ লোকে আত্মার শোভাবৃদ্ধিকর কাজ করিবে। এরূপ কর্ম্ম করাকে কর্ম্মমার্গ বলে। যাহা দ্বারা শরীর হইতে আত্মার বন্ধনমুক্তির যোগ সিদ্ধ হয়, তাহাই কর্ম্মযোগ। ইহাতে বিষয়াসক্তির স্থান থাকিতেই পারে না।

এ জন্য তুমি নিয়ত কর্ম্ম কর। কর্ম্ম না করার অপেক্ষা কর্ম্ম করাই ভাল। কর্ম্ম বিনা তোমার শরীর ধারণ করাও সম্ভব নয়। ৮

টিপ্পনী—নিয়ত শব্দ মূল শ্লোকে আছে। পূর্ব্বের শ্লোকের সহিত ইহার সম্বন্ধ রহিয়াছে। তাহাতে মন দ্বারা ইন্দ্রিয়গণকে নিয়মে রাখিয়া সঙ্গরহিত হইয়া কর্ম্ম করার প্রশংসা আছে। অর্থাৎ এখানে নিয়ত কর্ম্মের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়দিগকে নিয়মে রাখিয়া কর্ম্ম করার উপদেশ আছে।

যজ্ঞার্থ কর্ম্ম ভিন্ন অন্য কর্ম্মের দ্বারা ইহলোকে বন্ধন সৃষ্টি হয়। এ জন্য হে কৌন্তেয়! তুমি রাগরহিত হইয়া যজ্ঞার্থ কর্ম্ম কর। ৯

টিপ্পনী—যজ্ঞ অর্থাৎ পরোপকারার্থে, ঈশ্বরার্থে করা কাজ।

যজ্ঞ সহিত প্রজা সৃষ্টি করিয়া প্রজাপতি ব্রহ্মা কহিয়াছিলেন :—'এই যজ্ঞদ্বারা তোমরা বৃদ্ধি পাও। ইহা তোমাদের অভীপ্সিত ফল দান করুক। ১০

'তোমরা যজ্ঞদ্বারা দেবতাদের পোষণ করিবে, এবং দেবতারা তোমাদের পোষণ করিবেন, এবং একে অপরকে পোষণ করিয়া তোমরা পরম কল্যাণ পাইবে। ১১

'যজ্ঞদ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া দেবতারা তোমাদিগকে অভীষ্ট ভোগ প্রদান করিবেন। পরিবর্ত্তে কিছু না দিয়া তাহাদের প্রদত্ত জিনিষ যে উপভোগ করে, সে অবশ্যই চোর। ১২

টিপ্পনী—এখানে দেবতার অর্থ ঈশ্বরের সৃষ্ট ভূতমাত্র। ভূতমাত্রের সেবা দেবসেবা এবং ইহাই যজ্ঞ।

যাহারা যজ্ঞের অবশিষ্ট জিনিষ খায়, তাহারা সব পাপ হইতে মুক্ত হয়। যাহারা আপনাদের জন্য পাক করে, তাহারা পাপ ভক্ষণ করে। ১৩

অন্ন হইতেই ভূতমাত্র উৎপন্ন হয়। অন্ন বৃষ্টি হইতে উৎপন্ন হয়। বৃষ্টি যজ্ঞ হইতে এবং যজ্ঞ কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

১৪

কর্ম্ম প্রকৃতি হইতে এবং প্রকৃতি অক্ষর ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হয় জানিবে; এবং সেজন্য সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্ম সর্ব্বদা যজ্ঞে অধিষ্ঠিত থাকেন। ১৫

এই প্রকার প্রবর্ত্তিত চক্রের অনুসরণ যে না করে, সে ব্যক্তি নিজের জীবন পাপ-ময় করে। সে ইন্দ্রিয়সুখে আবদ্ধ রহে এবং হে পার্থ! বৃথাই বাঁচিয়া থাকে। ১৬

পরন্তু যে মানুষ আত্মাতেই রমণ করে, আত্মাতেই তৃপ্ত থাকে, এবং আত্মাতেই সন্তুষ্ট থাকে, তাহার কিছু করার থাকে না। ১৭

কাজ করা না করার ভিতর তাহার কোনোই স্বার্থ নাই। সৃষ্টির কোনো পদার্থে তাহার কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ নাই। ১৮

এ জন্য তুমি সঙ্গরহিত বা আসক্তিশূন্য হইয়া নিরন্তর কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর। আসক্তি-হীন হইয়া কর্ম্ম করিলে লোকে মোক্ষ পায়। ১৯

জনকাদি কর্ম্মদ্বারাই পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। লোকসংগ্রহের (লোক সকলকে স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তনের) দৃষ্টিতেও তোমার কর্ম্ম করা উচিত। ২০

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যে আচরণ করেন অপর ব্যক্তিরা তাহা অনুকরণ করে। তিনি যাহাকে প্রামাণ্য বলিয়া মানেন, লোকে তাহার অনুবর্ত্তন করে। ২১

হে পার্থ! ত্রিভুবনে আমার কিছুই করার নাই। প্রাপ্তিযোগ্য কোনো জিনিষ আমার অপ্রাপ্ত নাই, তথাপি আমি কর্ম্মে প্রবৃত্ত আছি। ২২

টিপ্পনী—সূর্য্য, চন্দ্র ইত্যাদির অবিরাম এবং নির্ভুল গতি ঈশ্বরের কর্ম্মের পরিচয় দিতেছে।

এই কর্ম্ম মানসিক নহে, বরং শারীরিক বলিয়া গণ্য। ঈশ্বর নিরাকার হইয়াও শারীরিক কর্ম্ম করেন ইহা কিরূপে কহা যায়? এখানে এই আশঙ্কার স্থান নাই; কেন না তিনি অশরীরী হইয়াও শরীর-ধারীর ন্যায় আচরণ করিতেছেন এরূপ দেখা যায়। এজন্য তিনি কর্ম্ম করিয়াও অকর্ম্মী ও অলিপ্ত। মানুষের তো ইহাই বুঝিতে হইবে যে, যেরূপ ঈশ্বরের প্রত্যেক কাজ যন্ত্রবৎ চলে, সেইরূপ মানুষ বুদ্ধিপূর্ব্বক অথচ যন্ত্রবৎ নিয়মিত কাজ করিবে। মানুষের বৈশিষ্ট্য যন্ত্রের ন্যায় নিয়মিত কাজ না করিয়া স্বেচ্ছাচারী হওয়ার ভিতর নাই, বরং জ্ঞানপূর্ব্বক ঐ গতির অনুকরণ করার ভিতরই আছে। অলিপ্ত থাকিয়া সঙ্গরহিত হইয়া যন্ত্রবৎ কার্য্য করিলে, তাহার গায়ে সংসারের স্পর্শ লাগে না। মরণ পর্য্যন্ত সে তাজা থাকে। দেহ দেহের নিয়মানুসারে সময় মত নষ্ট হয়, কিন্তু

দেহের অভ্যন্তরস্থ আত্মা পূর্ব্বে যেরূপ ছিল সেইরূপই থাকিয়া যায়।

যদি আমি কখনও অনলস হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত না রহি, তবে হে পার্থ! লোকে সব রকমে আমার আচরণের অনুসরণ করিবে। ২৩

যদি আমি কর্ম্ম না করি তবে এই সকল লোক উৎসন্ন হইয়া যাইবে, আমি অব্যবস্থার কর্ত্তা এবং এই সব লোকের নাশের কারণ হইব। ২৪

হে ভারত! যেরূপে অজ্ঞানী লোক আসক্ত হইয়া কাজ করে, লোক-কল্যাণের ইচ্ছায় সেরূপে জ্ঞানীর আসক্তিরহিত হইয়া কাজ করা উচিত। ২৫

কর্ম্মে আসক্ত অজ্ঞানী লোকের বুদ্ধিকে

জ্ঞানী যেন বিচলিত না করে, পরন্তু যোগ-যুক্ত হইয়া ভালভাবে কাজ করিয়া তাহাদিগকে সকল কর্ম্মে যেন প্রণোদিত করে। ২৬

সকল কর্ম্ম প্রকৃতির গুণদ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। অহঙ্কারে মূঢ় লোকে আমি করি এরূপ মনে করে। ২৭

হে মহাবাহো! গুণ ও কর্ম্মের বিভাগের রহস্য যে জানে এরূপ পুরুষ গুণ গুণের কর্ম্ম করিতেছে ইহা জানিয়া উহাতে আসক্ত হয় না। ২৮

টিপ্পনী—যেরূপ শ্বাসাদি ক্রিয়া আপনা হইতে হয় বলিয়া তাহাতে মানুষ আসক্ত হয় না; কিন্তু যখন ঐ অঙ্গের কোন ব্যারাম হয়, মানুষ তখন সে বিষয়ে চিন্তা করে, অথবা তার অস্তিত্বের

কথা মনে হয়; সেইরূপ স্বাভাবিক কর্ম্ম আপনা হইতে হইতে থাকিলে উহাতে আসক্তি হয় না। যাহার স্বভাব উদার, সে স্বয়ং আপনার উদারতার কথা জানেই না; পরন্তু সে দান না করিয়া থাকিতে পারে না। অভ্যাস এবং ঈশ্বরকৃপা দ্বারাই এরূপ অনাসক্তি লাভ হয়।

প্রকৃতির গুণ দ্বারা মুগ্ধ হইয়া মানুষ গুণের কার্য্যে আসক্ত হয়। জ্ঞানীরা যেন এই সব অজ্ঞানী, মন্দবুদ্ধিদিগকে বিচালিত না করেন। ২৯

অধ্যাত্মবৃত্তি রক্ষা করিয়া সকল কর্ম্ম আমাতে অর্পণ করিয়া বিবেক বুদ্ধি দ্বারা আসক্তি ও সকল মমত্ব ত্যাগ করিয়া রাগরহিত হইয়া তুমি যুদ্ধ কর। ৩০

টিপ্পনী—সেবক যেমন প্রভুর অধীন থাকিয়া

কাজ করে এবং সব কিছু তাহাকে অর্পণ করে সেরূপ যে ব্যক্তি শরীরস্থ আমাকে চেনে এবং পরমাত্মার অংশ বলিয়া জানে, সে সবই পরমাত্মাকে অর্পণ করে। • •

যে শ্রদ্ধাবান মানুষ দ্বেষ ত্যাগ করিয়া আমার এই মত অনুসারে চলে, সে কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয়। ৩১

পরন্তু যাহারা আমার এই মতের ত্রুটী বাহির করিয়া ইহার অনুসরণ না করে, তাহারা জ্ঞানহীন মূর্খ। তাহারা নষ্ট হইয়াছে জানিও। ৩২

জ্ঞানবান ব্যক্তিও নিজের স্বভাব অনুসারে চলে; প্রাণীমাত্র নিজের স্বভাবের অনুসরণ করে, এখানে বলপ্রয়োগ কি করিতে পারে? ৩৩

টিপ্পনী—এই শ্লোক দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৬১ শ্লোক অথবা ৬৮ শ্লোকের বিরোধী নহে। ইন্দ্রিয় নিগ্রহের জন্য মানুষকে মৃত্যু পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে হইবে, তথাপি সফলতা না মিলিলে নিগ্রহ অর্থাৎ বলপ্রয়োগ নিরর্থক। ইহাতে নিগ্রহের নিন্দা করা হয় নাই, স্বভাবের প্রভাব দেখান হইয়াছে। ইহা আমার স্বভাব একথা বলিয়া কেহ যদি হাল ছাড়িয়া দিয়া বসে, তবে সে এই শ্লোকের অর্থ বুঝে নাই। স্বভাবের স্বরূপ আমরা জানি না। সাধারণ অভ্যাসকে স্বভাব বলা যায় না। আর আত্মার স্বভাব ঊর্দ্ধগমন। অর্থাৎ যখন আত্মার অধোগতি হয়, তখন তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়া কর্ত্তব্য। ইহা নীচের শ্লোকে স্পষ্ট করা হইয়াছে।

আপন আপন বিষয়ে ইন্দ্রিয়গণের রাগ-দ্বেষ আছে। মানুষের তাহাদের বশ

না হওয়া চাই ; কারণ তাহারা মানুষের পথের শত্রু। ৩৪

টিপ্পনী—কানের বিষয় শোনা। যাহা ভাল লাগে তাহা শোনার ইচ্ছাই রাগ বা আসক্তি। যাহা ভাল না লাগে তাহা শোনার অনিচ্ছা দ্বেষ। 'ইহা তো স্বভাব' ইহা কহিয়া রাগ দ্বেষের বশ না হইয়া তাহার সম্মুখীন হওয়া চাই। আত্মার স্বভাব সুখ দুঃখ হইতে মুক্ত থাকা। এই স্বভাব তক মানুষের পৌঁছান চাই।

পরের ধর্ম্ম সুলভ হইলেও তাহা অপেক্ষা নিজের বিগুণ ধর্ম্মও অনেক ভাল। স্বধর্ম্মে মৃত্যুও ভাল। পরধর্ম্ম ভয়ানক। ৩৫

টিপ্পনী—সমাজে একের ধর্ম্ম ঝাঁট দেওয়া ও অপরের ধর্ম্ম হিসাব রাখা হইতে পারে। হিসাব রক্ষকের কাজ উত্তম মনে করা হয় বলিয়া ঝাড়ুদার

আপনার ধর্ম্ম ছাড়িলে সে ভ্রষ্ট হয় আর ইহাতে সমাজের হানি হয়। ঈশ্বরের দরবারে উভয়ের সেবার মূল্য তাহাদের নিষ্ঠা অনুসারে স্থির হইবে। সেখানে সকল প্রকার উপজীবিকার মূল্যই এক। উভয়ে ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে আপনার কর্ত্তব্য করিলে সমানরূপে মোক্ষের অধিকারী হয়।

অর্জ্জুন কহিলেন—

হে বার্ষ্ণেয়! লোকে কিসের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া অনিচ্ছা সত্ত্বে যেন বল পূর্ব্বক নিয়োজিত হইয়া পাপ করে? ৩৬

শ্রীভগবান কহিলেন—

রজোগুণ হইতে উৎপন্ন কাম এবং ক্রোধ এই প্রেরক। ইহাদের পেট ভরেই না। ইহারা মহাপাপী এবং ইহলোকে ইহাদিগকে শত্রু বলিয়া জানিবে। ৩৭

টিপ্পনী—আমাদের বাস্তবিক শত্রু অন্তরে থাকে, তাহাকে কামই বল আর ক্রোধই বল।

যেরূপ ধূম দ্বারা অগ্নি, ময়লা দ্বারা দর্পণ অথবা ঝিল্লী দ্বারা গর্ভ ঢাকা থাকে, সেইরূপ কামাদিরূপ শত্রু দ্বারা এই জ্ঞান ঢাকা থাকে। ৩৮

হে কৌন্তেয়! যাহাকে তৃপ্ত করা যায় না সেই কামরূপ অগ্নি নিত্যশত্রু, ইহা দ্বারা জ্ঞানীর জ্ঞান আবৃত হয়। ৩৯

ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি এই শত্রুর (কামের) নিবাসস্থান। ইহাদের দ্বারা জ্ঞানকে ঢাকিয়া এই শত্রু দেহীকে বিমোহিত করে। ৪০

টিপ্পনী—ইন্দ্রিয়মধ্যে কাম আশ্রয় লইলে মন মলিন হয়, বিবেকশক্তি মন্দ হয়, জ্ঞান নষ্ট হয়। দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৬২-৬৪ শ্লোক দেখ।

হে ভারতশ্রেষ্ঠ! এজন্য তুমি প্রথমে ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া জ্ঞান এবং অনুভবের নাশকারী এই পাপীকে অবশ্য ত্যাগ কর। ৪১

ইন্দ্রিয়গণ সূক্ষ্ম, তাহাদের অপেক্ষা অধিক সূক্ষ্ম মন, তাহা অপেক্ষা অধিক সূক্ষ্ম বুদ্ধি। যাহা বুদ্ধি অপেক্ষা অত্যন্ত সূক্ষ্ম তাহাই আত্মা। ৪২

টিপ্পনী—অর্থাৎ যদি ইন্দ্রিয় বশে থাকে, তবে সূক্ষ্ম কামকে জয় করা সহজ।

এইরূপে বুদ্ধির অতীত আত্মাকে চিনিয়া এবং আত্মা দ্বারা মনকে বশীভূত করিয়া হে মহাবাহো! কামরূপ দুর্জ্জয় শত্রুকে সংহার কর। ৪৩

টিপ্পনী—যদি মানুষ শরীরস্থ আত্মাকে জানে,

তবে মন তাহার বশে থাকে, ইন্দ্রিয়ের বশে থাকে না। আর মন যদি জয় করা যায়, তবে কাম কি করিতে পারে?

ওঁ তৎ সৎ

এই প্রকারে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপ উপনিষদ অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যান্তর্গত যোগশাস্ত্রের শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে কর্ম্মযোগ নামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

চতুর্থ অধ্যায়

জ্ঞানকর্ম্মসন্ন্যাসযোগ

এই অধ্যায়ে তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত বিষয়ের বিশদ আলোচনা এবং বিভিন্ন প্রকারের কয়েকটি যজ্ঞের বর্ণনা আছে।

শ্রীভগবান কহিলেন—

এই অবিনাশী যোগ আমি বিবস্বানকে (সূর্য্যকে) বলিয়াছিলাম। তিনি মনুকে এবং মনু ইক্ষ্বাকুকে বলিয়াছিলেন। ১

রাজর্ষিগণ এরূপে পরম্পরাপ্রাপ্ত যোগ জানিতেন। কালক্রমে তাহা নষ্ট হইয়াছে। ২

এই পুরাতন যোগ আমি আজ

তোমাকে বলিলাম, কারণ তুমি আমার ভক্ত ও সখা এবং এই যোগ উত্তম ও গুহ্য। ৩

অর্জ্জুন কহিলেন—

তোমার জন্ম সম্প্রতি হইয়াছে, আর বিবস্বানের জন্ম তো পূর্ব্বে হইয়াছিল। তবে আমি কিরূপে জানিব যে, তুমি উহা (ঐ যোগ) পূর্ব্বে কহিয়াছিলে? ৪

শ্রীভগবান কহিলেন—

হে অর্জ্জুন! আমার এবং তোমার জন্ম তো অনেক বার হইয়া গিয়াছে। হে পরন্তপ! আমি সে সবই জানি, কিন্তু তুমি জান না। ৫

আমি জন্মরহিত, অবিনাশী আর ভূতমাত্রের ঈশ্বর, তথাপি নিজের স্বভাবকে

আশ্রয় করিয়া স্বীয় মায়া দ্বারা আমি জন্ম গ্রহণ করি। ৬

হে ভারত! যে যে সময় ধর্ম্ম মন্দীভূত হয়, অধর্ম্মের বৃদ্ধি 'হয়, সেই সেই সময় আমি জন্ম গ্রহণ করি। ৭

সাধুদের রক্ষা, দুষ্টদের বিনাশ, এবং ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার জন্য আমি যুগে যুগে জন্ম গ্রহণ করি। ৮

টিপ্পনী—এখানে শ্রদ্ধাবানদিগের প্রতি আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে এবং সত্য বা ধর্ম্ম যে অবিচল তাহা বলা হইয়াছে। এই জগতে পাপ-পুণ্যের জোয়ার-ভাটা হইয়া থাকে। পরন্তু শেষকালে ধর্ম্মেরই জয় হয়। সাধুজনের নাশ হয় না, কারণ সত্যের নাশ নাই। দুষ্টের নাশ হয়, কারণ অসত্যের অস্তিত্ব নাই। ইহা জানিয়া

যেন মানুষ নিজের কর্ত্তৃত্বের অভিমানবশে হিংসা না করে ও দুরাচারী না হয়। ঈশ্বরের গভীর মায়া নিজের কাজ করিয়া যাইতেছে। ইহাই অবতার অথবা ঈশ্বরের জন্মের তাৎপর্য্য। বস্তুত ঈশ্বরের জন্ম তো হয়ই না।

হে অর্জ্জুন! এরূপে যে ব্যক্তি আমার দিব্য জন্ম ও কর্ম্মের রহস্য জানে, সে শরীর ত্যাগ করিয়া পুনর্জ্জন্ম পায় না, পরন্তু আমাকে পায়। ৯

টিপ্পনী—কারণ যখন মানুষের এই দৃঢ় বিশ্বাস হইয়া যায় যে, ঈশ্বর সত্যের জয় করাইয়া থাকেন, তখন সে সত্যকে ছাড়ে না। সে ধৈর্য্য ধারণ করে, দুঃখ সহ্য করে, এবং মমতারহিত হইয়া জন্মমৃত্যুর চক্র হইতে মুক্ত হইয়া ঈশ্বরের ধ্যান করিতে করিতে তাহাতেই লীন হয়।

রাগ ভয় ও ক্রোধ রহিত হইয়া আমার ধ্যান করিতে করিতে, আমাকে আশ্রয় করিয়া, জ্ঞানরূপ তপস্যা দ্বারা পবিত্র হইয়া অনেকে আমার স্বরূপ পাইয়াছে। ১০

যে যেভাবে আমার আশ্রয় লয়, আমি তাহাকে সেই ভাবে ফল দান করি। হে পার্থ! যে যাহাই করুক (অর্থাৎ ফলাকাঙ্খী হইয়া যে যে-দেবতারই ভজনা করুক না কেন) মানুষ সকল প্রকারে আমারই মার্গ অনুসরণ করে বা আমার শাসনের অধীন থাকে। ১১

টিপ্পনী—অর্থাৎ কেহ ঐশ্বরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পারে না। যেমন বপন করিবে, তেমন ফল পাইবে। ঈশ্বরীয় নিয়মের বা কর্ম্মের নিয়মের ব্যতিক্রম নাই। সকলেই সমান অর্থাৎ নিজের

যোগ্যতা অনুসারে যাহার যাহা প্রাপ্য সে তাহাই পায়।

ইহলোকে কর্ম্মজনিত সিদ্ধি শীঘ্র পাওয়া যায় বলিয়া মানুষ কর্ম্মের সিদ্ধির ইচ্ছায় দেবতাদের পূজা করে। ১২

টিপ্পনী—দেবতার অর্থ স্বর্গবাসী ইন্দ্র বরুণাদি নহে। দেবতার অর্থ ঈশ্বরের অংশরূপ শক্তি। এই অর্থে মানুষও দেবতা। বাষ্প বিদ্যুৎ আদি মহাশক্তি সকল দেবতা। ইহাদের আরাধনার ফল শীঘ্র এবং ইহলোকেই পাওয়া যায়, তাহা আমরা দেখিতেছি। এই ফল ক্ষণস্থায়ী। ইহাতে যখন আত্মার সন্তোষ বিধান করিতে পারে না, তখন কিরূপে মোক্ষদান করিতে পারে?

গুণ এবং কর্ম্মের বিভাগ অনুসারে আমি চারি বর্ণ সৃষ্টি করিয়াছি। ইহাদের

কর্ত্তা হইলেও আমাকে তুমি অবিনাশী অকর্ত্তা বলিয়া জানিও। ১৩

কর্ম্ম আমাকে স্পর্শ করেনা। আমার কর্ম্মফলের লালসা নাই। যে ব্যক্তি আমাকে এইরূপে ভাল ভাবে জানে সে কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হয় না। ১৪

টিপ্পনী—এখানে মানুষের সম্মুখে কর্ম্ম করিয়াও অকর্ম্মী থাকার সর্ব্বোত্তম দৃষ্টান্ত দেওয়া হইল। ঈশ্বরই সকলের কর্ত্তা, আর আমরা যদি নিমিত্ত মাত্র হই, তবে কর্ত্তৃত্বের অভিমান কিরূপে থাকিতে পারে?

ইহা জানিয়া পূর্ব্বকালের মুমুক্ষু ব্যক্তিরা কর্ম্ম করিয়াছে। অতএব তুমিও পূর্ব্ববর্ত্তীদের মত সর্ব্বদা কর্ম্ম কর। ১৫

কর্ম্ম কি, অকর্ম্মই বা কি ইহা নির্ণয়

করিতে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরও মোহ জন্মে। কর্ম্ম সম্বন্ধে আমি তোমাকে প্রকৃষ্টরূপে বলিব। ইহা জানিয়া তুমি অশুভ হইতে রক্ষা পাইবে। ১৬

কর্ম্ম, নিষিদ্ধ কর্ম্ম এবং অকর্ম্মের ভেদ জানা দরকার। কর্ম্মের গতি অতি গূঢ়। ১৭

কর্ম্মে যে অকর্ম্ম দেখে, আর অকর্ম্মে যে কর্ম্ম দেখে, তাহাকে মানুষের মধ্যে বুদ্ধিমান বলা হয়। সে যোগী ও সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা। ১৮

টিপ্পনী—কর্ম্ম করিয়াও যে কর্ত্তৃত্বের অভিমান রাখে না, তাহার কর্ম্ম অকর্ম্ম, এবং যে ব্যক্তি বাহিরের কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াও মনে মনে কর্ম্মের কল্পনা করে, তাহার অকর্ম্মই কর্ম্ম। যাহার অঙ্গ পক্ষাঘাতে অবশ হইয়া গিয়াছে, সে যখন

ইচ্ছাপূর্ব্বক অভিমান পূর্ব্বক—অসাড় অঙ্গকে নাড়ায়, তখন উহা নড়ে। এই ব্যধিগ্রস্ত অঙ্গই হইল নড়ানর কর্ত্তা। আত্মার গুণ অকর্ত্তার ন্যায়। যে ব্যক্তি মোহগ্রস্ত হইয়া নিজেকে কর্ত্তা ভাবে, তাহার আত্মা পক্ষাঘাতগ্রস্ত মনে করিবে; আর সে অভিমান বশে কাজ করে। এইরূপে যে কর্ম্মের গতি জানে, ঐ বুদ্ধিমান যোগী কর্ত্তব্য-পরায়ণ বলিয়া গণ্য হয়। 'আমি করিতেছি' এরূপ যে মনে করে সে কর্ম্ম বিকর্ম্মের ভেদ ভুলিয়া যায় এবং সাধনের ভালমন্দের বিচার করে না। আত্মার স্বাভাবিক গতি ঊর্দ্ধদিকে, এজন্য যখন মানুষ নীতিভ্রষ্ট হয়, তখন তাহার ভিতর অহঙ্কার অবশ্যই আছে একথা কহা যায়। অভিমানরহিত পুরুষের কর্ম্ম সহজেই সাত্ত্বিক হয়।

যাহার সকল প্রকার উদ্যোগ, কামনা ও সঙ্কল্প রহিত হইয়াছে, তাহার কর্ম্ম

জ্ঞানরূপ অগ্নিদ্বারা ভস্ম হইয়া গিয়াছে; এরূপ লোককে জ্ঞানীরা পণ্ডিত কহে। ১৯

যে ব্যক্তি কর্ম্মফলের আসক্তি ত্যাগ করিয়া সদা সন্তুষ্টচিত্ত ও আশ্রয়লালসাহীন হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকে সে কর্ম্ম করিতেছে না এরূপ বলা যায়। ২০

টিপ্পনী—অর্থাৎ তাহাকে কর্ম্মের বন্ধনভোগ করিতে হয় না।

যে আশারহিত, যাহার মন নিজের বশে আছে, যে সংগ্রহ মাত্র ত্যাগ করিয়াছে, এবং যাহার শরীর মাত্রই কর্ম্ম করে, সে কর্ম্ম করিয়াও দোষযুক্ত হয় না। ২১

টিপ্পনী—অভিমানের সহিত অনুষ্ঠিত কর্ম্ম যতই সাত্ত্বিক হউক না কেন, তাহা বন্ধনের কারণ। কর্ম্ম যখন ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধি দ্বারা অভিমানশূন্য হয়,

তখন বন্ধনরহিত হয়। যাহার 'আমিত্ব' লোপ হইয়াছে, তাহার কেবল শরীরই কর্ম্ম করে। নিদ্রিত মানুষেরও কেবল শরীরই কর্ম্ম করে ইহা বলা চলে। যখন কোনো কয়েদী বলপ্রয়োগের অধীন হইয়া অনিচ্ছায় হল চালনা করে, তখন তাহারও কেবল শরীরই কর্ম্ম করে। যে স্বেচ্ছায় ঈশ্বরের কয়েদী হয়, তাহারও ঐরূপ কেবল শরীরই কর্ম্ম করে। তাহার নিজত্ব শূন্য হইয়া যায়, ঈশ্বরই তাহার কর্ম্মের প্রেরক।

যে সহজে প্রাপ্ত দ্রব্যে সন্তুষ্ট, সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত, দ্বেষরহিত এবং সফলতা নিষ্ফলতা সমান জ্ঞান করে, সে কর্ম্ম করিয়াও বন্ধনে আবদ্ধ হয় না। ২২

যে আসক্তিরহিত, যার চিত্ত জ্ঞানময়, যে মুক্ত এবং যে কেবল যজ্ঞার্থে কর্ম্ম করে, তার কর্ম্মমাত্র লয় পায়। ২৩

(যজ্ঞে) অর্পণ অর্থাৎ হোম করিবার ক্রিয়া ব্রহ্ম, হবি বা হবনের বস্তু ব্রহ্ম, ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে যজ্ঞকারীও ব্রহ্ম। এই প্রকার যে কর্ম্মের সহিত ব্রহ্মের মিলন সাধন করিয়াছে সে ব্রহ্মকেই পায়। ২৪

কোনো কোনো যোগী দেবতাদের পূজারূপ যজ্ঞ করে, অপর যোগিগণ ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে যজ্ঞের দ্বারাই হোম করে। ২৫

আর কেহ কেহ শ্রবনাদি ইন্দ্রিয়ের সংযমরূপ যজ্ঞ করে এবং কেহ বা শব্দাদি বিষয় সকলকে ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে হোম করে। ২৬

টিপ্পনী—শ্রবণ ক্রিয়া ইত্যাদির সংযম করা এক কথা, আর ইন্দ্রিয়দিগকে কাজে খাটাইয়া তাহাদের বিষয় সকল প্রভুর প্রীতির জন্য কাজে

লাগান আর এক কথা, যেমন ভজনাদি শোনা। বস্তুতঃ দুইই এক।

আবার অন্যে ইন্দ্রিয় এবং প্রাণের সমস্ত কর্ম্মকে জ্ঞানালোকে প্রজ্জ্বলিত করিয়া আত্মসংযম রূপ যোগাগ্নিতে হোম করে। ২৭

টিপ্পনী—অর্থাৎ পরমাত্মায় তন্ময় হইয়া যায়।

এইরূপে কেহ যজ্ঞার্থে দ্রব্য দান করে, কেহ তপস্যা করে। কতজন অষ্টাঙ্গযোগ সাধন করে, কতজন স্বাধ্যায় এবং জ্ঞান যজ্ঞ করে। ইহারা সকলে কঠিন ব্রতধারী প্রযত্নশীল যাজ্ঞিক। ২৮

অপরে প্রাণায়ামে তৎপর থাকিয়া অপান বায়ুতে প্রাণবায়ু হোম করে,

প্রাণবায়ুতে অপান বায়ু হোম করে; বা প্রাণ অথবা অপান দুটির গতি রোধ করে অর্থাৎ কুম্ভক করে। ২৯

টিপ্পনী—তিন প্রকারের প্রাণায়াম আছে—রেচক, পূরক ও কুম্ভক। সংস্কৃতে প্রাণবায়ুর অর্থ গুজরাতীর উন্টা। প্রাণবায়ু ভিতর হইতে বাহিরে আসে। আমরা বাহির হইতে যাহাকে ভিতরে টানিয়া লই সেই প্রাণবায়ু অক্সিজেন বা অম্লজান বায়ু নামে পরিচিত।

আর অপরে আহার সংযম করিয়া প্রাণমধ্যে প্রাণকে আহুতি দেয়। যজ্ঞদ্বারা যে ব্যক্তি পাপক্ষয় করিয়া ফেলিয়াছে, ঐ ব্যক্তি সকল যজ্ঞের তত্ত্বই অবগত আছে। ৩০

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! যে ব্যক্তি যজ্ঞের অবশিষ্ট

অমৃত ভক্ষণ করে, সে সনাতন ব্রহ্মকে পায়। যাহারা যজ্ঞ করে না তাহাদের ইহলোক যখন নাই, তখন পরলোক কিরূপে থাকিবে? ৩১

বেদে এই প্রকার অনেক যজ্ঞের বর্ণনা আছে। এই সকলকে কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন জানিও। ইহা জানিলে তুমি মোক্ষ পাইবে। ৩২

টিপ্পনী—এখানে কর্ম্মের ব্যাপক অর্থ আছে। অর্থাৎ ইহা শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক। এইরূপ কর্ম্ম বিনা যজ্ঞ হইতে পারে না। যজ্ঞ বিনা মোক্ষ হয় না। এইরূপ জানা এবং তদনুসারে আচরণ করার নামই যজ্ঞকে জানা। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মানুষ আপনার শরীর, বুদ্ধি এবং আত্মা প্রভু-প্রীত্যর্থে—লোকসেবার্থে

কাজে না লাগাইলে তাহাকে চোর ঠাওরাইতে হইবে, সে মোক্ষের যোগ্য নহে। যে কেবল বুদ্ধিশক্তিকেই কাজে লাগায় আর শরীর ও আত্মাকে চুরি করে (অর্থাৎ প্রভুপ্রীত্যর্থে শরীর ও আত্মার প্রয়োগ না করে) সে পুরা যাজ্ঞিক নহে; এই তিন শক্তির মিলন না হইলে তাহা পরোপকারার্থে লাগিতে পারে না। এ জন্য আত্মশুদ্ধি বিনা লোকসেবা অসম্ভব। সেবকের শরীর, বুদ্ধি এবং আত্মা বা নীতি—এই তিনেরই ভালরূপ বিকাশ করা কর্ত্তব্য।

হে পরন্তপ। দ্রব্যযজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞান-যজ্ঞ অধিক শ্রেষ্ঠ, কেননা, হে পার্থ। কর্ম্মমাত্রই জ্ঞানে পরাকাষ্ঠায় পৌঁছে। ৩৩

টিপ্পনী—পরোপকার বৃত্তিতে দেওয়া জিনিষও যদি জ্ঞানপূর্ব্বক দেওয়া না হয়, তবে তাহা

যথেষ্ট হানি করে, ইহা কে অনুভব করে নাই? সৎবৃত্তি হইতে উদ্ভূত সকল কর্ম্ম তখনই শোভা পায়, যখন তার সহিত জ্ঞানের মিলন থাকে। এজন্য কর্ম্মমাত্রেরই পূর্ণাহুতি জ্ঞানেই হয়।

এই জ্ঞান তুমি তত্ত্বজ্ঞানীদের সেবা করিয়া ও বিচার পূর্ব্বক নম্রতার সহিত বারংবার তাহাদিগকে প্রশ্ন করিয়া লাভ কর। তাঁহারা তোমার জিজ্ঞাসার সদুত্তর দিয়া তোমাকে তৃপ্ত করিবেন। ৩৪

টিপ্পনী—জ্ঞানলাভের তিনটি সর্ত্ত—প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবা এ যুগে বিশেষ ধ্যানযোগ্য। প্রণিপাত অর্থাৎ নম্রতা, বিচারশক্তি; পরিপ্রশ্ন অর্থাৎ বার বার প্রশ্ন করা; সেবাহীন নম্রতা খোসামুদির ভিতর থাকিতে পারে। আর অনুসন্ধান ভিন্ন জ্ঞানলাভ সম্ভব হয় না, অর্থাৎ যতক্ষণ না

বুঝিবে, ততক্ষণ শিষ্য গুরুকে নম্রতার সহিত প্রশ্ন করিবে। ইহাই জিজ্ঞাসা। ইহাতে শ্রদ্ধার প্রয়োজন। যাহার উপর শ্রদ্ধা হয় না, তাহার প্রতি আন্তরিক নম্রতা আসে না; অতএব তাহার সেবা করা কিরূপে সম্ভব?

হে পাণ্ডব! এই জ্ঞানলাভের পর তোমার আর এরূপ মোহ হইবে না; এই জ্ঞানদ্বারা তুমি ভূতমাত্রকে নিজের আত্মার ভিতর ও আমার ভিতর দেখিবে। ৩৫

টিপ্পনী—"যথা পিণ্ডে তথা ব্রহ্মাণ্ডে"র অর্থ এই—যাহার আত্মদর্শন হইয়াছে, সে আপনার আত্মা ও অপরের আত্মায় ভেদ দেখে না।

পাপীদের ভিতর তুমি সর্ব্বাপেক্ষা মহা পাপী হইলেও, জ্ঞানরূপ নৌকা দ্বারা তুমি সকল পাপই উত্তীর্ণ হইবে। ৩৬

হে অর্জ্জুন! যেরূপ প্রজ্জ্বলিত অগ্নি ইন্ধনকে ভস্ম করে, সেরূপ জ্ঞানরূপ অগ্নি সকল কর্ম্মকে ভস্ম করে। ৩৭

জ্ঞানের সমান পবিত্র এ জগতে আর কিছুই নাই। যোগ বা সমত্বে পূর্ণতাপ্রাপ্ত (অর্থাৎ যাহার যোগ বা কর্ম্মযোগ সিদ্ধ হইয়াছে) মানুষ কালে আপনা হইতেই ঐ জ্ঞান লাভ করে। ৩৮

শ্রদ্ধাবান, ঈশ্বরপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয় পুরুষ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া শীঘ্রই পরম শান্তি লাভ করে। ৩৯

অজ্ঞান, শ্রদ্ধারহিত ও সংশয়বানের নাশ হয়। সংশয়াত্মা ব্যক্তির না আছে ইহলোক, না আছে পরলোক, তাহার কোথাও সুখ নাই। ৪০

হে ধনঞ্জয়! যে বক্তি সমত্বরূপ যোগ দ্বারা কর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়াছে এবং জ্ঞান দ্বারা সংশয় ছিন্ন করিয়াছে, এরূপ আত্মদর্শীকে কর্ম্মে বন্ধন করে না। ৪১

অতএব হে ভারত! হৃদয়নিহিত অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন সংশয়কে আত্মজ্ঞানরূপ তলোয়ার দ্বারা নাশ করিয়া যোগ (সমত্ব) অবলম্বন করিয়া যুদ্ধার্থ উঠিয়া দাঁড়াও। ৪২

ওঁ তৎ সৎ

এইরূপে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপ উপনিষদ অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যান্তর্গত যোগশাস্ত্রের শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে জ্ঞানকর্ম্মসন্ন্যাসযোগ নামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

পঞ্চম অধ্যায়

কর্ম্মসন্ন্যাসযোগ

কর্ম্মযোগ বিনা কর্ম্মসন্ন্যাস হইতেই পারে না, আর বস্তুতঃ এ উভয়ই যে এক, তাহা এই অধ্যায়ে বলা হইয়াছে।

অর্জ্জুন কহিলেন—

হে কৃষ্ণ! তুমি একবার কর্ম্মত্যাগ (কর্ম্মসন্ন্যাস) ও আর একবার কর্ম্মযোগের প্রশংসা করিতেছ। এই দুটির ভিতর শ্রেয়স্কর কি, তাহা আমাকে নিশ্চয় করিয়া বল। ১

শ্রীভগবান কহিলেন—

কর্ম্মসন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ উভয়েই মোক্ষ-

দায়ক। ইহার ভিতর কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগ উৎকৃষ্ট। ২

যে দ্বেষ করে না, ইচ্ছা করে না তাহাকে নিত্যসন্ন্যাসী বলিয়া জানিবে। যে সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত, সে সহজেই বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। ৩

টিপ্পনী—তাৎপর্য্য এই যে, কর্ম্মত্যাগই সন্ন্যাসের বিশেষ লক্ষণ নহে, বরং দ্বন্দ্বাতীত হওয়াই ইহার লক্ষণ—কেহ কর্ম্ম করিয়াও সন্ন্যাসী হইতে পারে, অপরে কর্ম্ম না করিয়াও মিথ্যাচারী হইতে পারে। অধ্যায় ৩, শ্লোক ৬ দেখ।

অজ্ঞানীরা কহে সাংখ্য এবং যোগ—জ্ঞান এবং কর্ম্ম—ভিন্ন বস্তু, কিন্তু পণ্ডিতেরা এরূপ বলে না। ভালভাবে ইহার কোনো

একটির অনুষ্ঠান করিলে, উভয়ের ফল পাওয়া যায়। ৪

টিপ্পনী—জ্ঞানযোগী লোকসংগ্রহরূপ কর্ম্ম-যোগের বিশেষ ফল সংকল্পমাত্র পায়। কর্ম্মযোগী নিজের অনাসক্তির জন্য বাহ্যকর্ম্ম করিয়াও জ্ঞানযোগীর শান্তি অনায়াসে লাভ করে।

যে স্থান সাংখ্য যোগী পায় তাহাই কর্ম্মযোগীও পায়। যে ব্যক্তি সাংখ্য এবং কর্ম্মযোগকে একরূপ দেখে সে-ই যথার্থ-দর্শী। ৫

হে মহাবাহো! কর্ম্মযোগ বিনা কর্ম্ম-ত্যাগ কষ্টসাধ্য, পরন্তু সমত্বযুক্ত মুনি শীঘ্রই মোক্ষ পাইয়া থাকে। ৬

যে যোগ সাধন করিয়াছে, যে হৃদয়কে বিশুদ্ধ করিয়াছে এবং যে মন এবং

ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিয়াছে, আর যে ভূত-মাত্রকে নিজের সমান মনে করে, এরূপ মানুষ কর্ম্ম করিলেও কর্ম্ম হইতে অলিপ্ত রহে। ৭

দেখা, শুনা, স্পর্শ করা, সোঁকা, খাওয়া, চলা, শোয়া, শ্বাস লওয়া, বলা, ত্যাগ করা. লওয়া, চোখ মেলা, চোখ বন্ধ করার কাজে কেবল ইন্দ্রিয়গণই আপন আপন কার্য্য করিতেছে এরূপ ভাবনা রাখিয়া তত্ত্বজ্ঞ যোগী বুঝেন যে, 'আমি কিছুই করি না।' ৮-৯

টিপ্পনী—যতক্ষণ অভিমান থাকে, ততক্ষণ এই নির্লিপ্ত অবস্থা আসে না। এজন্য বিষয়াসক্ত মানুষ, 'আমি বিষয় ভোগ করি না, ইন্দ্রিয়গণ আপন আপন কাজ করিতেছে' এ কথা বলিয়া রেহাই পাইতে পারে না। এইরূপ ভুল-অর্থকারী

ব্যক্তি গীতাও বুঝেনা এবং ধর্ম্মও জানে না। এই বিষয় নীচের শ্লোক আরও স্পষ্ট করিতেছে।

যে মানুষ ব্রহ্মে ফল সমর্পণ করিয়া আসক্তি ছাড়িয়া কর্ম্ম করে, সে জলে পদ্ম যেমন অলিপ্ত থাকে তেমনি পাপ হইতে অলিপ্ত থাকে। ১০

যোগিগণ আসক্তিরহিত হইয়া আত্ম-শুদ্ধির জন্য শরীর, মন, বুদ্ধি এবং কেবল ইন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্ম করে। ১১

সমতাবান (যোগযুক্ত) ব্যক্তি কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া পরম শান্তি পায় ; অস্থির-চিত্ত ব্যক্তি কামনাবশে ফলাসক্ত হইয়া বদ্ধ হয়। ১২

সংযমী পুরুষ মন দ্বারা সকল কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, নবদ্বারযুক্ত নগররূপ শরীরে

অবস্থান করিয়া স্বয়ং কিছু না করিয়া বা অন্য দ্বারা না করাইয়া সুখে থাকে। ১৩

টিপ্পনী—দুই নাক, দুই কান, দুই চোখ, মলমূত্র ত্যাগের দুই স্থান, আর মুখ এই নয়টি শরীরের মুখ্য দ্বার। ইহা ভিন্ন চর্ম্মের অসংখ্য ছিদ্র মাত্রই শরীরের দ্বার। এই সকল দরজার চৌকীদার অর্থাৎ শরীরের মালিক যদি ইহার মধ্যে যাতায়াতকারী অধিকারীদের (ইন্দ্রিয়সকলের) আসিতে যাইতে দিয়া আপনার ধর্ম্ম পালন করে, তবে সেই চৌকীদার সম্বন্ধে বলা যায় যে, অধিকারীদের যাতায়াত কার্য্যের সে অংশীদার নহে কেবল সাক্ষী। এই জন্য সেই চৌকীদার সম্বন্ধে বলা যায়, সে কিছু করে না বা করায় না।

জগতের প্রভু (জীবের) কর্তৃত্ব বা কর্ম্মসকল সৃষ্টি করেন না; তিনি কর্ম্ম ও

কর্ম্মফলের সংযোগ সাধনও করেন না। প্রকৃতিই সব করে। ১৪

টিপ্পনী—ঈশ্বর কর্ত্তা নহেন। কর্ম্মের নিয়ম অটল ও অনিবার্য্য। যে যেরূপ কাজ করে, সে সেরূপ ফল পায়। ইহাতে ভগবানের মহা দয়া ও ন্যায়পরায়ণতা রহিয়াছে। শুদ্ধ ন্যায়ে শুদ্ধ দয়া আছে। ন্যায়বিরোধী দয়া দয়া নয়, পরন্তু নিষ্ঠুরতা। কিন্তু মানুষ ত্রিকালদর্শী নহে। সেজন্য তাহার পক্ষে দয়া এবং ক্ষমাই ন্যায়। ন্যায় বিচারই মানুষের প্রাপ্য কিন্তু সে নিরন্তর ক্ষমার যাজ্ঞা করে। সুতরাং সে ক্ষমাদ্বারাই অপরের বিচার করিতে পারে। ক্ষমাগুণ বিকাশ করিলে সে পরিণামে অকর্ত্তা, যোগী বা সমতাবান বা কর্ম্মে কুশল হয়।

ঈশ্বর কাহারও পাপ অথবা পুণ্যের দায়িত্ব লন না। অজ্ঞান দ্বারা জ্ঞান

ঢাকা পড়ে। এ জন্য লোকে মোহবদ্ধ হয়। ১৫

টিপ্পনী—অজ্ঞান হইতে—'আমি করিতেছি' এই ধারণা হইতে মানুষ কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হয়। তথাপি সে ভালমন্দ ফলের আরোপ ঈশ্বরের উপর করে, ইহা মোহজাল।

পরন্তু যাহাদের অজ্ঞান আত্মজ্ঞান দ্বারা নাশ হইয়া গিয়াছে, তাহাদের সূর্য্যসমান প্রকাশময় জ্ঞান পরম তত্ত্বকে দর্শন করায়। ১৬

জ্ঞান দ্বারা যাহাদের পাপ ধুইয়া গিয়াছে, যাহারা ঈশ্বরের ধ্যান করে, তাহাতে তন্ময় হয় ও স্থির থাকে, এবং তাঁহাকে সর্ব্বস্ব বলিয়া মানে তাহারা মোক্ষ পায়। ১৭

বিদ্বান ও বিনয়ী ব্রাহ্মণে, গরু এবং হাতীতে, কুকুর ও কুকুরভোজী মানুষে জ্ঞানী সম দৃষ্টি রাখে। ১৮

টিপ্পনী—অর্থাৎ জ্ঞানী আবশ্যকতা অনুসারে সকলের সেবা করে। ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালের প্রতি সমভাব রাখার অর্থ ব্রাহ্মণকে সাপে কাটিলে দংশিত স্থান যেমন প্রেমভরে চুষিয়া জ্ঞানী তাহাকে বিষমুক্ত করিতে চেষ্টা করিবে, চণ্ডালের বেলায়ও ঐরূপ করিবে।

যাহাদের মন সমত্বে স্থির হইয়াছে, তাহারা এই দেহেই সংসার জয় করিয়াছে। ব্রহ্ম নিষ্কলঙ্ক ও সমভাবসম্পন্ন, এজন্য তাহারা ব্রহ্মেই স্থির হইয়া আছে। ১৯

টিপ্পনী—মানুষ যেরূপ ও যাহার চিন্তা করে সেরূপ হইয়া থাকে। এজন্য সমত্বের

চিন্তা করিয়া নির্দ্দোষ হইয়া মূর্ত্তিমান সমত্ব নির্দ্দোষ ব্রহ্মকে সে পায়।

যাহার বুদ্ধি স্থির হইয়াছে, যাহার মোহ নষ্ট হইয়াছে, যে ব্রহ্মকে জানে এবং ব্রহ্মপরায়ণ রহে, সে প্রিয় জিনিষ পাইয়া সুখ আর অপ্রিয় জিনিষ পাইয়া দুঃখ মনে করে না। ২০

বাহ্য বিষয়ে যাহার আসক্তি নাই, এরূপ পুরুষ অন্তরে যে আনন্দ ভোগ করে, ঐ অক্ষয় আনন্দ উপরোক্ত ব্রহ্মপরায়ণ পুরুষ অনুভব করে। ২১

টিপ্পনী—যে অন্তর্ম্মুখ হইয়াছে, সে ঈশ্বর সাক্ষাৎ করিতে পারে আর সে-ই পরম আনন্দ পায়। বিষয় হইতে নিবৃত্ত রহিয়া কর্ম্ম করা এবং ব্রহ্ম সমাধিতে রমণ করা এই দুটি জিনিষ ভিন্ন নহে,

বরং একই বস্তুর দুই দিক---একই টাকার দু'পিঠ।

বিষয়জনিত ভোগ অবশ্যই দুঃখের কারণ। হে কৌন্তেয়! উহার আদি অন্ত আছে। বুদ্ধিমান মানুষ উহাতে রত হয় না। ২২

দেহত্যাগের পূর্ব্বে এই দেহেই যে ব্যক্তি কাম ও ক্রোধের বেগ সহ্য করার শক্তি প্রাপ্ত হয়, সে সমস্ত পাইয়াছে, সে সুখী। ২৩

টিপ্পনী—মৃত শরীরে যেরূপ ইচ্ছা অথবা দ্বেষ হয় না, সুখ দুঃখ হয় না, সেরূপ যে জীবিত থাকিয়াও মৃতের সমান—জড়ভরতের মত দেহাতীত রহিতে পারে, সে এই জগতে বিজয়ী এবং সে বাস্তবিক সুখ কি তাহা জানে।

যাহার অন্তরে আনন্দ আছে, যাহার অন্তরে শান্তি আছে, যাহার অবশ্য অন্তৰ্জ্ঞান হইয়াছে, সেই ব্রহ্মরূপ যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণ পায়। ২৪

যাহার পাপ নষ্ট হইয়াছে, যাহার সকল সংশয় ছিন্ন হইয়াছে, যে চিত্তকে বশীভূত করিয়াছে, আর যে প্রাণীমাত্রের হিতানুষ্ঠানে রত, এরূপ ঋষি ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। ২৫

যে আপনাকে জানে, যে কাম ক্রোধ জয় করিয়াছে, যে মনকে বশে আনিয়াছে, এরূপ যতিগণ সর্ব্বত্র ব্রহ্মনির্ব্বাণরূপ মোক্ষ পায়। ২৬

বাহ্য বিষয়ভোগ মনের বাহিরে রাখিয়া দৃষ্টিকে ভ্রূমধ্যে স্থির করিয়া, নাসিকা পথে যাতায়াতকারী প্রাণ ও অপান বায়ুর

গতি সমান করিয়া, ইন্দ্রিয় মন এবং বুদ্ধিকে বশে রাখিয়া এবং ইচ্ছা ভয় ও ক্রোধরহিত হইয়া যে মুনি মোক্ষপরায়ণ থাকে সে সদামুক্ত। ২৭-২৮

টিপ্পনী—প্রাণবায়ু ভিতর হইতে বাহিরে আসে, আর অপান বায়ু বাহির হইতে ভিতরে যায়। এই শ্লোক দুটিতে প্রাণায়াম আদি যৌগিক ক্রিয়ার সমর্থন আছে। প্রাণায়াম আদি তো বাহ্য ক্রিয়া। ইহা শরীরকে স্বস্থ রাখিতে এবং ইহাকে পরমাত্মার অবস্থান যোগ্য মন্দিরে পরিণত করিতে পারে মাত্র। সাধারণ ব্যায়ামাদি দ্বারা ভোগীর যে কাজ হয়, উহাই যোগীর প্রাণায়ামাদি দ্বারা হয়। ভোগীর ব্যায়ামাদি তাহার ইন্দ্রিয়-দিগকে উত্তেজিত করার সাহায্য করে। প্রাণায়া-মাদি যোগীর শরীরকে নিরোগ এবং কঠিন করিয়া ইন্দ্রিয়দিগকে শান্ত রাখার সাহায্য করে।

আজকাল প্রাণায়ামাদির বিধি খুব কম লোকে জানে এবং তাহাদের ভিতরকার অতি অল্প লোকেই ইহার সদ্ব্যবহার করে। যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির উপর কম, পক্ষে প্রাথমিক বিজয় লাভ করিয়াছে, যাহার মোক্ষের উৎকট আকাঙ্ক্ষা আছে, যে রাগ দ্বেষাদি জয় করিয়াছে, ভয় ত্যাগ করিয়াছে, তাহার পক্ষে প্রাণায়াম প্রভৃতি উপযোগী এবং সহায়ক। অন্তঃশৌচ বিনা প্রাণায়ামাদি বন্ধনের এক কারণ হইয়া মানুষকে মোহকূপে অধিক নীচে লইয়া যাইতে পারে এবং লইয়া যায়—অনেকের এই অভিজ্ঞতা আছে। এজন্য যোগীন্দ্র পতঞ্জলি যমনিয়মকে প্রথম স্থান দিয়া সাধকের জন্য প্রাণায়ামাদিকে মোক্ষমার্গের সহায়ক মনে করিয়াছেন।

যম পাঁচ প্রকার :—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ। নিয়ম পাঁচ প্রকার :—শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান।

যজ্ঞ ও তপের ভোক্তা সকল লোকের মহেশ্বর এবং ভূতমাত্রের হিতকারী আমাকে জানিয়া (উক্ত মুনি) শান্তি প্রাপ্ত হয়। ২৯

টিপ্পনী—কেহ যেন না ভাবেন, এই শ্লোক এই অধ্যায়ের চৌদ্দ ও পনের শ্লোক অথবা এইরূপ অপর শ্লোকের বিরোধী। ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান হইয়াও কর্ত্তা-অকর্ত্তা, ভোক্তা-অভোক্তা, যাহা বল তাহাই এবং তাহাই নহেন। তিনি অবর্ণনীয় তিনি মানুষের ভাষার অতীত। এ জন্য তাহাতে পরস্পরবিরোধী গুণ আর শক্তির আরোপ করিয়া মানুষ তাঁহার দর্শনের আশা রাখে।

ওঁ তৎ সৎ

এই প্রকারে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপ উপনিষদ অর্থাৎ ব্রহ্ম-বিদ্যান্তর্গত যোগশাস্ত্রের শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে কর্ম্মসন্ন্যাসযোগ নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ধ্যানযোগ

এই অধ্যায়ে যোগ সাধনের অর্থাৎ সমত্ব-লাভের কয়েকটি উপায় বলা হইয়াছে।

শ্রীভগবান কহিলেন—

কর্ম্মফলের আশ্রয় না লইয়া যে ব্যক্তি
বিহিত কর্ম্ম করে সে সন্ন্যাসী, সে যোগী;
যে অগ্নি ও ক্রিয়ামাত্র ত্যাগ করিয়া বসে,
সে সন্ন্যাসী বা যোগী নহে। ১

টিপ্পনী—অগ্নি অর্থাৎ সাধনমাত্র। যখন অগ্নিদ্বারা হোম হইত, তখন অগ্নির আবশ্যকতা ছিল। এ যুগে চরকাই সেবার সাধন; সে জন্য এখন চরকা ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হওয়া যায় না।

হে পাণ্ডব! যাহাকে সন্ন্যাস কহে, তাহাকে তুমি যোগ (কর্ম্মযোগ) বলিয়া জানিও। যে ব্যক্তি মনের সংকল্প ত্যাগ করে নাই, সে কখনও যোগী হইতে পারে না। ২

যোগ সাধন করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তির কর্ম্মই সাধন; যিনি যোগারূঢ় হইয়াছেন কর্ম্মত্যাগই তাহার সাধন। ৩

টিপ্পনী—যাহার আত্মশুদ্ধি ও সমত্বসাধন হইয়াছে, আত্মদর্শন তাহার পক্ষে সহজ। ইহার অর্থ এরূপ নহে যে যোগারূঢ় ব্যক্তির লোক-সংগ্রহ করার জন্যও কর্ম্ম করার কোনো প্রয়োজন থাকে না। লোকসংগ্রহ বিনা সে তো জীবিত থাকিতেই পারে না। অর্থাৎ সেবা কর্ম্ম করাও তাহার পক্ষে স্বাভাবিক হইয়া যায়। সে লোক

দেখানর জন্য কিছুই করে না। অধ্যায় ৩-৪ শ্লোক, অধ্যায় ৫-২ শ্লোক মিলাইয়া দেখ।

যখন মানুষ ইন্দ্রিয়গণের বিষয়ে অথবা কর্ম্মে আসক্ত না হয়, এবং সকল সংকল্প ত্যাগ করে, তখন তাহাকে যোগারূঢ় কহে। ৪

আত্মাদ্বারা মানুষ আত্মাকে উদ্ধার করিবে, তাহার অধোগতি করিবে না। আত্মাই আত্মার বন্ধু ও আত্মাই আত্মার শত্রু। ৫

যে নিজের বলে মনকে জয় করিয়াছে, তাহার আত্মা তাহার বন্ধু; যে আত্মাকে জয় করে নাই, সে নিজের প্রতি শত্রুর মত ব্যবহার করে। ৬

যে নিজের মন জয় করিয়াছে এবং

সম্পূর্ণরূপে শান্ত হইয়া গিয়াছে, তাহার আত্মা শীত-উষ্ণ সুখ-দুঃখ ও মান-অপমানে একই ভাবে থাকে। ৭

যাহার চিত্ত জ্ঞান ও অনুভূতিদ্বারা তৃপ্ত হইয়াছে, যে অবিচল, যে জিতেন্দ্রিয়, আর যার নিকট মাটী পাথর এবং সোনা সমান, এরূপ ঈশ্বরপরায়ণ মানুষকে যোগী বলে। ৮

হিতেচ্ছু, মিত্র, শত্রু, অপক্ষপাতী, উভয়ের মঙ্গলকারী, দ্বেষী, বন্ধু, সাধু ও পাপী এই সকলকে যে সমদৃষ্টিতে দেখে সে শ্রেষ্ঠ। ৯

চিত্ত স্থির করিয়া বাসনা ও সংগ্রহ ত্যাগ করিয়া, একাকী নির্জ্জন স্থানে থাকিয়া যোগী নিরন্তর আত্মাকে পরমাত্মার সহিত যুক্ত করে। ১০

পবিত্র স্থানে, কুশের উপর মৃগচর্ম্ম এবং তার উপর বস্ত্র বিছাইয়া, খুব নীচু নহে খুব উঁচু নহে এরূপ স্থির আসন পাতিয়া, তার উপর একাগ্র মনে বসিয়া, চিত্ত এবং ইন্দ্রিয়দিগকে বশ করিয়া, আত্মশুদ্ধির জন্য যোগী যোগ সাধন করিবে। ১১-১২

শরীর, গ্রীবা ও মস্তক সম রেখায় অচল রাখিয়া স্থির হইয়া এদিক ওদিক না তাকাইয়া, নিজের নাসিকার অগ্রভাগে নজর রাখিয়া, পূর্ণ শান্তির সহিত, ভয়রহিত হইয়া, ব্রহ্মচর্য্যে দৃঢ় থাকিয়া, মনকে সংযত করিয়া আমাপরায়ণ হইয়া যোগী আমার ধ্যান করিতে বসিবে। ১৩-১৪

টিপ্পনী—নাসিকাগ্রের অর্থ ভ্রূর মধ্যের স্থান। অধ্যায় ৫-২৭ শ্লোক দেখ। ব্রহ্মচর্য্যব্রতের

অর্থ শুধু বীর্য্যসংগ্রহই নহে; পরন্তু ব্রহ্মকে পাওয়ার জন্য আবশ্যক অহিংসাদি সব ব্রত।

এইরূপে সংযতচিত্ত যোগী (অর্থাৎ যাহার মন নিয়মের ভিতর আছে) সদা আত্মাকে পরমাত্মার সহিত সমাহিত করে এবং আমার স্বরূপভূত মোক্ষরূপ পরম শান্তি পায়। ১৫

হে অর্জ্জুন! যাহারা অতি মাত্রায় ভোজন অথবা উপবাস করে, যাহারা অতি নিদ্রাশীল অথবা অতি জাগরণশীল, তাহারা সমত্বরূপ যোগ পায় না। ১৬

যাহার আহার বিহার, শয়ন জাগরণ, অন্যান্য কর্ম্ম পরিমিত, তাহার যোগ দুঃখ ভঞ্জন করে। ১৭

ভালরূপে নিয়মবদ্ধ মন যখন আমাতে স্থির হয়, এবং মানুষ যখন কামনা মাত্রে নিস্পৃহ হয়, তখন তাহাকে যোগী বলে। ১৮

আত্মাকে পরমাত্মার সহিত যুক্ত করিতে যে চেষ্টিত, সেই স্থিরচিত্ত যোগীর অবস্থা বায়ুরহিত স্থানের নিশ্চল প্রদীপের সমান কহা যায়। ১৯

যে অবস্থায় যোগদ্বারা বশীভূত মন শান্তি পায়, যে অবস্থায় মানুষ আত্মাদ্বারা আত্মাকেই দেখিয়া আত্মাতে সন্তোষ পায়, যে অবস্থায় ইন্দ্রিয়ের অতীত ও বুদ্ধিগ্রাহ্য অনন্ত সুখ অনুভব হয়, যেখানে থাকিলে মানুষ মূলবস্তু হইতে বিচলিত হয় না, যাহা পাইলে অন্য লাভকে অধিক বোধ হয় না,

এবং যে অবস্থায় উপস্থিত হইলে মহাদুঃখেও অভিভূত করিতে পারে না, সেই দুঃখরহিত অবস্থার নাম যোগ। এই যোগ অবসাদশূন্য হৃদয়ে দৃঢ়তাপূর্ব্বক সাধন করা কর্ত্তব্য। ২০-২১-২২-২৩

সংকল্প হইতে উৎপন্ন সকল কামনা পুরাপুরি ত্যাগ করিয়া, মন দ্বারা ইন্দ্রিয়দিগকে সকল দিক হইতে ভালভাবে সংযত করিয়া, অচল বুদ্ধি দ্বারা যোগী ধীরে ধীরে শান্ত হইয়া ও মনকে আত্মায় স্থির করিয়া অপর কোনো বিষয় চিন্তা করিবে না। ২৪-২৫

চঞ্চল ও অস্থির মন যে যে বিষয়ে যাইবে (যোগী) সেই সেই বিষয় হইতে তাহাকে প্রত্যাহার করিয়া নিজের বশে রাখিবে। ২৬

যাহার মন ভালভাবে শান্ত হইয়াছে, যাহার বিকার শান্ত হইয়া গিয়াছে, এরূপ ব্রহ্মময় নিষ্পাপ কর্ম্মযোগী অবশ্যই উত্তম সুখ পায়। ২৭

এইরূপে মন সর্ব্বদা স্ববশে রাখিয়া যে পাপরহিত হইয়াছে, সেই যোগী (কর্ম্মযোগী) সহজে ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ অনন্ত সুখ অনুভব করে। ২৮

সর্ব্বত্র সমভাব রক্ষাকারী যোগী আপনাকে ভূতমাত্রে এবং ভূতমাত্রকে আপনাতে দেখে। ২৯

যে আমাকে সর্ব্বত্র দেখে এবং সকলকে আমার ভিতর দেখে, সে আমার দৃষ্টির বাহির হয় না এবং আমিও তাহার দৃষ্টির বাহির হই না। ৩০

আমাতে লীন হইয়া যে-যোগী ভূতমাত্রে স্থিত আমাকে ভজনা করে, সে যে ভাবেই থাকুক না কেন আমাতেই থাকে। ৩১

টিপ্পনী—যতক্ষণ 'আমি' থাকিবে, ততক্ষণ পরমাত্মা পর। আমিত্ব লোপ হইলে—শূন্য হইলে, লোকে এক পরমাত্মাকে সর্ব্বত্র দেখে। অধ্যায় ১৩-২৩ শ্লোকের টিপ্পনী দেখ।

হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি সকলকে নিজের ন্যায় দেখে, ও সুখ-দুঃখ উভয়কে সমান ভাবে, সে শ্রেষ্ঠ যোগী বলিয়া গণ্য হয়। ৩২

অর্জ্জুন কহিলেন—

হে মধুসূদন! তুমি যাহা বলিলে, চঞ্চলতার জন্য সেই সমত্বরূপ যোগের স্থিরতা আমি দেখিতে পাইতেছি না। ৩৩

কারণ হে কৃষ্ণ! মন চঞ্চল, বলবান, ইহা মানুষকে অস্থির করিয়া তোলে। বায়ুকে দাবাইয়া রাখা যেমন কঠিন, মনকে বশ করাও তেমনি কঠিন মনে করি। ৩৪

শ্রীভগবান বলিলেন—

হে মহাবাহো! চঞ্চলস্বভাব মনকে বশ করা কঠিন তাহা ঠিক। পরন্তু হে কৌন্তেয়! অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা উহাকে বশে আনা যায়। ৩৫

আমার ধারণা এই যে, যার মন নিজের বশে নাই, যোগ-সাধন করা তাহার পক্ষে কঠিন; পরন্তু যার মন নিজের বশে আছে, আর যে যত্নশীল, সে সদুপায় দ্বারা যোগ-সাধন করিতে পারে। ৩৬

অর্জ্জুন বলিলেন—

হে কৃষ্ণ! যে শ্রদ্ধাবান, পরন্তু যত্ন শিথিল হওয়াতে যে যোগভ্রষ্ট হইয়াছে, সে সফলতা না পাইয়া কোন্ গতি পায়? ৩৭

হে মহাবাহো! যোগভ্রষ্ট হইয়া ব্রহ্মমার্গ হইতে চ্যুত হইয়া ঐ ব্যক্তি ছিন্নভিন্ন মেঘের ন্যায় উভয়ভ্রষ্ট হইয়া তো নষ্ট হয় না? ৩৮

হে কৃষ্ণ! তুমি আমার এই সংশয় দূর করার যোগ্য। তুমি ছাড়া আর কেহ ইহা দূর করিতে পারিবে না। ৩৯

শ্রীভগবান কহিলেন—

হে পার্থ! কি ইহলোক কি পরলোক কোথাও এরূপ লোকের নাশ হয় না।

হে তাত! কল্যাণমার্গের পথিকের কখনও কোনো দুর্গতি হয় না। ৪০

পুণ্যবান লোকে যে স্থান পায়, তাহা পাইয়া যোগভ্রষ্ট মানুষ সেখানে দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়া পবিত্র ও সাধনশীলের ঘরে জন্ম গ্রহণ করে। ৪১

অথবা জ্ঞানবান যোগীর কুলে সে জন্ম লয়। সংসারে এইরূপ জন্মও অবশ্য বহুত দুর্লভ। ৪২

হে কুরুনন্দন! সেখানে পূর্ব্বজন্মের বুদ্ধি সংস্কার সে পায়, সেখান হইতে মোক্ষের জন্য আরও অগ্রসর হয়। ৪৩

পূর্ব্বের অভ্যাসের জন্য সে অবশ্য যোগের দিকে আকৃষ্ট হয়। যোগ-জিজ্ঞাসুও

সকাম বৈদিক-কর্ম্মকাণ্ডীর অবস্থা পার হইয়া যায়। ৪৪

আর উৎসাহের সহিত প্রযত্নশীল যোগী পাপমুক্ত হইয়া অনেক জন্মের পর বিশুদ্ধ হইয়া পরম গতি পায়। ৪৫

তপস্বী অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ, কর্ম্মকাণ্ডী অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ। অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি যোগী বা কর্ম্মযোগী হও। ৪৬

টিপ্পনী—এখানে তপস্বীর তপস্যা ফলেচ্ছা-যুক্ত, এবং জ্ঞানীর অর্থ অনুভবজ্ঞানী নহে।

সকল যোগীর ভিতর যে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আমাতে চিত্ত সমর্পণ করিয়া আমাকে

ভজনা করে, তাহাকে আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগী মনে করি। ৪৭

ওঁ তৎ সৎ

এই প্রকারে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপ উপনিষদ অর্থাৎ ব্রহ্ম-বিদ্যান্তর্গত যোগশাস্ত্রের শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে ধ্যানযোগ নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

সপ্তম অধ্যায়

জ্ঞানবিজ্ঞানযোগ

ঈশ্বরতত্ত্ব ও ঈশ্বরভক্তি কি তাহা এই অধ্যায়ে বুঝান স্থরু হইয়াছে।

শ্রীভগবান বলিলেন—

হে পার্থ! আমার প্রতি মন লাগাইয়া আর আমার আশ্রয় লইয়া যোগসাধন করিলে তুমি কিরূপে আমাকে নিশ্চয়পূর্ব্বক এবং সম্পূর্ণরূপে চিনিবে তাহা শুন। ১

এই অনুভবযুক্ত জ্ঞান আমি তোমাকে পূর্ণরূপে কহিব। ইহা জানার পর ইহলোকে তোমার অধিক কিছু জানা বাকী থাকিবে না। ২

হাজার মানুষের মধ্যে কদাচিৎ কেহ সিদ্ধির জন্য যত্ন করে; প্রযত্নশীল সিদ্ধদিগের মধ্যেও কদাচিৎ কেহ আমাকে বাস্তবিক রূপে জানে। ৩

পৃথিবী, জল, আগুন, বাতাস, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহংভাব আমার এই আট প্রকার প্রকৃতি। ৪

টিপ্পনী—এই আট তত্ত্বযুক্ত স্বরূপই ক্ষেত্র অর্থাৎ ক্ষর পুরুষ। অধ্যায় ১৩—৫ শ্লোক ও অধ্যায় ১৫—১৬ শ্লোক দেখ।

ইহাকে অপরা প্রকৃতি কহে; ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পরা প্রকৃতি আছে তাহা জীবরূপ। হে মহাবাহো! এই জীবরূপ পরাপ্রকৃতিই এই সমস্ত জগৎকে ধারণ করিয়া আছে। ৫

এই উভয়কেই তুমি ভূতমাত্রের উৎপত্তির কারণ বলিয়া জানিও। সমুদয় জগতের উৎপত্তি এবং লয়ের কারণ আমি। ৬

হে ধনঞ্জয়! আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অপর কেহ নাই। যেমন সূতায় মনিসকল গাঁথা থাকে, সেইরূপ এই জগৎ আমাতে গাঁথা আছে। ৭

হে কৌন্তেয়! আমি জলে রসরূপে, চন্দ্রসূর্য্যে তেজরূপে, বেদসমূহে ওঁকাররূপে, আকাশে শব্দরূপে, পুরুষে পরাক্রমরূপে বিদ্যমান আছি। ৮

আমি পৃথিবীতে সুগন্ধরূপে, আগুনে তেজরূপে, প্রাণীমাত্রে জীবনরূপে, তপস্বীর মধ্যে তপরূপে বিরাজ করিতেছি। ৯

হে পার্থ! সকল জীবের সনাতন বীজ বলিয়া আমাকে জান। বুদ্ধিমানের বুদ্ধি আমি, তেজস্বীর তেজ আমি। ১০

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! বলবানের কামরাগ-রহিত (কামনা ও আসক্তিশূন্য) বল আমি এবং প্রাণীগণ মধ্যে আমি ধর্ম্মের অবিরোধী কাম। ১১

সাত্ত্বিক, রাজসী ও তামসী যে-যে ভাব আছে সে-সব আমা হইতে উৎপন্ন জানিবে। পরন্তু আমি যে তাহাদের মধ্যে আছি ইহা নহে, তাহারা আমাতে আছে। ১২

টিপ্পনী—এই ভাবের উপর পরমাত্মা নির্ভর করেন না। পরন্তু এই ভাবই তাঁহার উপর নির্ভর করে। এই ভাব তাঁহার আশ্রয়ে ও বশে আছে।

এই ত্রিগুণ ভাব দ্বারা সমস্ত জগৎ

মোহিত হইয়া রহিয়াছে; আর এজন্য তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং স্বতন্ত্র—অবিনাশী—আমাকে তাহারা চেনে না। ১৩

আমার এই ত্রিগুণাত্মক দৈবী মায়া পার হওয়া মুস্কিল। পরন্তু যে আমারই শরণ লয়, সে এই মায়া উত্তীর্ণ হইয়া যায়। ১৪

দুরাচারী, মূঢ়, অধম মানুষ আমার শরণ লয় না। তাহারা আসুরী ভাবযুক্ত এবং মায়াদ্বারা তাহাদের জ্ঞান অপহৃত হইয়াছে। ১৫

হে অর্জ্জুন! চার প্রকার সদাচারী মানুষ আমাকে ভজন করে—দুঃখী, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী (কিছু প্রাপ্তির ইচ্ছাকারী) অথবা জ্ঞানী। ১৬

তার মধ্যে যে নিত্যযুক্ত ও একনিষ্ঠ সাধক সে-ই জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ। আমি জ্ঞানীর অত্যন্ত প্রিয় ও জ্ঞানী আমার প্রিয়। ১৭

এই সকল ভক্তই ভাল, কিন্তু আমার মত এই যে, জ্ঞানী আমার আত্মা। কারণ আমাকে পাওয়া অপেক্ষা অপর অধিক উত্তম কোনো গতি নাই জানিয়া ঐ যোগী আমারই আশ্রয় লয়। ১৮

বহু জন্মের পর জ্ঞানী আমাকে পায়। সব বাসুদেবময় ইহা যে জানে এরূপ মহাত্মা অতি দুর্লভ। ১৯

অনেক কামনা দ্বারা যাহাদের জ্ঞান অপহৃত হইয়াছে, এইরূপ লোকে নিজ নিজ প্রকৃতি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন বিধির আশ্রয় লইয়া অপর দেবতাদের শরণ লয়। ২০

যে-যে ব্যক্তি যে-যে স্বরূপকে ভক্তি শ্রদ্ধার সহিত অর্চ্চনা করিতে ইচ্ছা করে, সেই সেই স্বরূপ সম্বন্ধে তাহাদের শ্রদ্ধাকে আমি দৃঢ় করি। ২১

শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তাহারা ঐ সব স্বরূপের আরাধনা করে এবং তদ্দ্বারা আমার সৃষ্ট তাহাদের ঈপ্সিত কামনা সকল পূর্ণ করে। ২২

ঐ সব অল্পবুদ্ধি লোক যে ফল পায় তাহা বিনাশশীল। দেবতাদের ভক্তেরা দেবতাদিগকে পায়, আমার ভক্তেরা আমাকে পায়। ২৩

আমার পরম অবিনাশী এবং অনুপম স্বরূপ যাহারা জানে না, এরূপ বুদ্ধিহীন লোকে ইন্দ্রিয়ের অতীত আমাকে ইন্দ্রিয়গম্য মনে করে। ২৪

নিজের যোগমায়ায় আচ্ছাদিত আমি সকলের নিকট প্রকট হই না। এই মূঢ় জগৎ জন্মরহিত ও অব্যয় আমাকে ভাল ভাবে জানে না। ২৫

টিপ্পনী—এই দৃশ্য জগৎ সৃষ্টি করিবার শক্তি ধারণ করিয়াও, অলিপ্ত থাকার হেতু পরমাত্মার ভিতর যে অদৃশ্য থাকিবার ভাব আছে তাহাই তাঁহার যোগমায়া।

হে অর্জ্জুন! অতীত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ সকল ভূতকে আমি জানি, পরন্তু আমাকে কেহই জানে না। ২৬

হে ভারত! হে পরন্তপ। ইচ্ছা ও দ্বেষ হইতে উৎপন্ন সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্বের মোহজন্য প্রাণীমাত্র এই জগতে মোহাবিষ্ট থাকে। ২৭

পরন্তু যে সব সদাচারী লোকের পাপ

শেষ হয় এবং যাহারা দ্বন্দ্বের মোহ হইতে মুক্ত হইয়াছে, সেই অটল ব্রতধারী ব্যক্তিগণ আমাকে ভজনা করে। ২৮

যাহারা আমার আশ্রয় লইয়া জরা ও মরণ হইতে মুক্ত হওয়ার উদ্যোগ করে তাহারা পূর্ণ ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম এবং সকল কর্ম্মকে জানে। ২৯

অধিভূত, অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞযুক্ত আমাকে যাহারা জানে, তাহারা সমত্ব পাইয়া আমাকে মৃত্যুর সময়েও জানে। ৩০

টিপ্পনী—অধিভূতাদির অর্থ অষ্টম অধ্যায়ে আছে। এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, এ জগতে ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুই নাই—সকল কর্ম্মের কর্ত্তা ভোক্তা তিনি, এরূপ বুঝিয়া মৃত্যুর সময় যে শান্ত থাকিয়া ঈশ্বরে তন্ময় থাকে এবং যার ঐ সময় আর

কোনো বাসনা থাকে না সে ঈশ্বরকে চেনে এবং মোক্ষ পায়।

ওঁ তৎ সৎ ।

এই প্রকারে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপ উপনিষদ অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যান্তর্গত যোগশাস্ত্রের শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে জ্ঞানবিজ্ঞান নামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

অষ্টম অধ্যায়

অক্ষরব্রহ্মযোগ

এই অধ্যায়ে ঈশ্বরতত্ত্ব বিশেষরূপে বুঝান আছে।

অর্জ্জুন কহিলেন—

হে পুরুষোত্তম! এই ব্রহ্মের স্বরূপ কি? অধ্যাত্ম কি? কর্ম্ম কি? অধিভূত এবং অধিদৈব কাহাকে বলে? ১

হে মধুসূদন! এই দেহে অধিযজ্ঞ কি এবং ইহা কিরূপে অবস্থান করে? আর সংযমীরা মৃত্যুর সময় কি প্রকারে তোমাকে জানে? ২

শ্রীভগবান কহিলেন—

যিনি সর্ব্বোত্তম অবিনাশী তিনি ব্রহ্ম, প্রাণী মাত্রে স্বসত্তার সহিত যিনি থাকেন তিনি অধ্যাত্ম এবং প্রাণী মাত্রের উৎপন্নকারী সৃষ্টিব্যাপারকে কর্ম্ম বলে। ৩

অধিভূত আমার নাশবান স্বরূপ; ইহাতে অধিষ্ঠানকারী আমার জীবস্বরূপই অধিদৈব। আর হে মনুষ্যশ্রেষ্ঠ! এই শরীরে বাসকারী যজ্ঞদ্বারা শুদ্ধ জীবস্বরূপই অধিযজ্ঞ। ৪

টিপ্পনী—তাৎপর্য্য এই যে, অব্যক্ত ব্রহ্ম হইতে নাশবান দৃশ্য পদার্থ মাত্রই পরমাত্মা এবং সমস্তই তাহার কৃতি বা কার্য্য। তবে মানুষ কর্ত্তৃত্বের অভিমান না রাখিয়া, পরমাত্মার দাস হইয়া, সব কিছু তাহাকে কেন না সমর্পণ করিবে?

অন্তকালে যে আমার স্মরণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করে, সে যে আমার স্বরূপ পায়, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। ৫

অথবা হে কৌন্তেয়! মানুষ নিত্য যে-যে স্বরূপের ধ্যান করে, অন্তকালেও তাহাদের স্বরূপ স্মরণ করিয়া সে দেহত্যাগ করে এবং এজন্য সে ঐ স্বরূপকে পায়। ৬

এ হেতু সর্ব্বদা আমার স্মরণ কর এবং যুদ্ধ করিতে থাক; এরূপে আমাতে মন ও বুদ্ধি রাখিলে অবশ্য আমাকে পাইবে। ৭

হে পার্থ! চিত্তকে অভ্যাস দ্বারা স্থির করিয়া, অন্যত্র কোথাও যাইতে না দিয়া, যে ব্যক্তি একনিষ্ঠভাবে দিব্য পবম পুরুষের ধ্যান করে সে তাঁহাকে পায়। ৮

যে ব্যক্তি মরণকালে অবিচলিত চিত্তে ভক্তির সহিত ভ্রূযুগলের মধ্যে ভালভাবে প্রাণকে স্থাপিত করিয়া সর্ব্বজ্ঞ, পুরাতন, নিয়ন্তা, সূক্ষ্মতম, সকলের পালনকর্ত্তা, অচিন্ত্য, সূর্য্যসমান তেজস্বী, অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের অতীত স্বরূপকে ঠিক ভাবে স্মরণ করে সে দিব্য পরমপুরুষকে পায়। ৯-১০

বেদজ্ঞগণ যাহাকে অক্ষর নামে বর্ণন করে, বীতরাগী মুনি যাহাতে প্রবেশ করে, যাহাকে প্রাপ্তির ইচ্ছায় লোকে ব্রহ্মচর্য্য পালন করে, ঐ পদের সংক্ষিপ্ত বর্ণন তোমার নিকট করিব। ১১

ইন্দ্রিয়ের সকল দ্বার রুদ্ধ করিয়া, মনকে হৃদয়ে স্থির করিয়া, মস্তকে প্রাণ ধারণ করিয়া, সমাধিস্থ হইয়া একাক্ষর ব্রহ্ম

'ওঁ'এর উচ্চারণ ও আমার চিন্তন করিতে করিতে যে মানুষ দেহ ত্যাগ করে সে পরম গতি পায়। ১২-১৩

হে পার্থ! চিত্তকে অন্য কোথাও না রাখিয়া, যে নিত্য এবং নিরন্তর আমাকেই স্মরণ করে, ঐ নিত্যযুক্ত যোগী আমাকে সহজে পায়। ১৪

আমাকে পাইয়া পরম গতিপ্রাপ্ত মহাত্মা দুঃখের আলয় স্বরূপ অশাশ্বত পুনর্জন্ম পায় না। ১৫

হে কৌন্তেয়! ব্রহ্মলোক হইতে যত লোক আছে, সে সব স্থান হইতে পুনঃ পুনঃ ফিরিয়া আসিতে হয়। পরন্তু আমাকে পাওয়ার পর মানুষের পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। ১৬

হাজার যুগ পর্য্যন্ত ব্রহ্মার এক দিন এবং হাজার যুগ পর্য্যন্ত ব্রহ্মার এক রাত—ইহা যে জানে সে রাত দিন জানে। ১৭

টিপ্পনী—তাৎপর্য্য, আমাদের চব্বিশ ঘণ্টার রাত দিন কালচক্রের ভিতর এক মুহূর্ত্তের অপেক্ষাও সূক্ষ্ম—ইহার কোনো মূল্য নাই। এ জন্য এ সময়ে প্রাপ্ত ভোগকে আকাশ কুসুমবৎ মনে করিয়া করিয়া তাহার প্রতি আমাদের উদাসীন থাকা উচিত; এবং যে সময় আমরা পাই, তাহা ভগবদ্ভক্তি ও সেবার কার্য্যে ব্যয় করিয়া সার্থক করা চাই এবং যদি আজই আত্মদর্শন না হয়, তবে ধৈর্য্য ধারণ করা চাই।

(ব্রহ্মার) দিন আরম্ভ হইলে সকল অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত পদার্থ সৃষ্ট হয় আর রাত্রি হইলে তাহাদের প্রলয় হয় অর্থাৎ তাহারা অব্যক্তে লয় পায়। ১৮

টিপ্পনী—ইহা জানিয়াও মানুষের বুঝা চাই যে তাহার হাতে অতি অল্প ক্ষমতা আছে। উৎপত্তি ও নাশের কাজ এক সাথে চলে।

হে পার্থ! এই সমুদয় প্রাণী এইরূপে উৎপন্ন হইয়া, রাত্রি হইলে বিবশ হইয়া লয় প্রাপ্ত হয় এবং দিন আসিলে পুনরায় উৎপন্ন হয়।১৯

এই অব্যক্তের অতীত এরূপ অপর এক সনাতন অব্যক্ত ভাব আছে। সমস্ত প্রাণী ধ্বংস হইলেও এই সনাতন অব্যক্ত ভাব নাশ হয় না। ২০

যে অব্যক্তকে অক্ষর (অবিনাশী) বলে তাহাকেই পরম গতি বলা হয়। যাহা পাইলে লোকের আর পুনর্জন্ম হয় না তাহা আমার পরম ধাম। ২১

হে পার্থ অনন্যভক্তি দ্বারা এই উত্তম

পুরুষের দর্শন হয়। ইহাতে সকল প্রাণী রহিয়াছে। আর এই সব প্রাণী তাহার দ্বারাই ব্যাপ্ত হইয়াছে। ২২

হে ভরতর্ষভ! যে কালে মৃত্যু হইলে যোগী মোক্ষ পায় আর যে কালে মরিলে তাহার পুনর্জন্ম হয় সে কালের কথা আমি তোমাকে বলিব। ২৩

উত্তরায়ণের ছয় মাসে শুক্লপক্ষে দিনের বেলায় যখন অগ্নির তেজ খুব বেশী থাকে, তখন যাহার মৃত্যু হয় সেই ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মকে পায়। ২৪

দক্ষিণায়ণের ছয়মাসে কৃষ্ণপক্ষে রাত্রি কালে যখন ধুঁয়ার প্রভাব বেশী হয়, তখন মরিলে লোকে চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া পুনর্জন্ম লাভ করে। ২৫

টিপ্পনী—উপরোক্ত দুটি শ্লোক আমি পুরা-পুরি বুঝি নাই। উহাদের শব্দার্থের সহিত গীতার শিক্ষার মিল নাই। গীতার শিক্ষানুসারে যে ব্যক্তি ভক্তিমান, যে জ্ঞানী, যে সেবা-মার্গে চলে, সে যখনই মরুক তাহার মোক্ষ হইবে। এই দুটি শ্লোকের অর্থ গীতার শিক্ষার বিরোধী। ইহাদের ভাবার্থ এরূপ করা যাইতে পারে, যে যজ্ঞ করে, অর্থাৎ পরোপকারেই জীবন ব্যয় করে, যাহার জ্ঞান হইয়াছে, যে ব্রহ্মবিদ্ অর্থাৎ জ্ঞানী, মৃত্যু সময়ও যদি তাহার এরূপ স্থিতি হয় তবে সে মোক্ষ পাইবে। ইহার উল্টা, যে যজ্ঞ করে না, যার জ্ঞান নাই, যার ভক্তি নাই সে চন্দ্রলোক অর্থাৎ ক্ষণিক লোক প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় ভবচক্রে ঘুরিবে। চন্দ্রের নিজের জ্যোতি নাই।

পূর্ব্বাপর হইতে জগতে জ্ঞান আর

অজ্ঞানের দুটি মার্গ বা পথ আছে। এক অর্থাৎ জ্ঞান মার্গের মানুষ মোক্ষ পায় এবং অপর অর্থাৎ অজ্ঞান মার্গ দ্বারা সে পুনর্জন্ম পায়। ২৬

হে পার্থ! এই দুই মার্গের কথা জানা কোনো যোগী মোহগ্রস্ত হয় না। এজন্য হে অর্জ্জুন! তুমি সর্ব্বদা যোগযুক্ত থাক। ২৭

টিপ্পনী—দুই মার্গ জানা সমভাবরক্ষাকারী ব্যক্তি অন্ধকার বা অজ্ঞানের পথে চলে না। ইহার নামই মোহগ্রস্ত না হওয়া।

বেদে, যজ্ঞে, তপে আর দানে যে পুণ্যফল হয়, ইহা জানিলে তাহা অতিক্রম করিয়া যোগী উত্তম আদি স্থান পায়। ২৮

টিপ্পনী—অথাৎ যে ব্যক্তি জ্ঞান, ভক্তি ও সেবা কাজ দ্বারা সমত্ব লাভ করিয়াছে তাহার শুধু

পুণ্যফলই লাভ হয় না, তাহার মোক্ষপদও লাভ হইয়া থাকে।

ওঁ তৎ সৎ

এই প্রকারে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপ উপনিষদ অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যান্তর্গত যোগশাস্ত্রের শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে অক্ষর ব্রহ্মযোগ নামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

নবম অধ্যায়

রাজবিদ্যারাজগুহ্যযোগ

এ অধ্যায়ে ভক্তির মহিমা গাওয়া হইয়াছে।

শ্রীভগবান বলিলেন—

তুমি দ্বেষরহিত বলিয়া তোমাকে আমি গুহ্য হইতে গুহ্য অনুভবযুক্ত জ্ঞান দান করিব। ইহা জানিলে তুমি অকল্যাণ হইতে রক্ষা পাইবে। ১

সকল বিদ্যার মধ্যে ইহা রাজা বা শ্রেষ্ঠ, গুহ্য বস্তুর মধ্যেও ইহা রাজা বা গুহ্যতম। এই বিদ্যা পবিত্র, উত্তম, প্রত্যক্ষ অনুভব-যোগ্য, ধর্ম্মানুগত, সহজে আচরণযোগ্য এবং অবিনাশী। ২

হে পরন্তপ! এই ধর্ম্মে যাহাদের শ্রদ্ধা নাই, তাহারা আমাকে না পাইয়া মৃত্যুময় সংসারমার্গে বার বার যাতায়াত করে। ৩

আমার অব্যক্ত স্বরূপ দ্বারা এই সমুদয় জগৎ ব্যাপ্ত আছে। সকল প্রাণী আমাতে বা আমার আধারে অবস্থিত, (কিন্তু) আমি সে সকলে অবস্থিত নহি। ৪

তথাপি প্রাণীগণ আমাতে নাই ইহাও বলা চলে। আমার এই যোগবল তুমি দেখ। আমি জীব সকলের পালনকর্ত্তা, তথাপি আমি তাহাদের ভিতর নাই; পরন্তু আমি তাহাদের উৎপত্তির কারণ। ৫

টিপ্পনী—আমাতে সব জীব আছে এবং নাই, আমি ঐ সকলেতে আছি এবং নাই। ইহা ঈশ্বরের যোগবল, তাহার মায়া, তাহার চমৎকারিত্ব।

ভগবানকে মানুষের ভাষায় ঈশ্বরের বর্ণনা করিতে হইতেছে। এজন্য অনেক প্রকারের ভাষাপ্রয়োগ না করিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছেন না। সবই ঈশ্বরময় এ হেতু সবই তাঁহাতে রহিয়াছে। তিনি অলিপ্ত। সাধারণ অর্থে তিনি কর্ত্তা নহেন। এজন্য তাঁহাতে জীব নাই কহা যায়। পরন্তু যে তাঁহার ভক্ত তাহার ভিতর তিনি অবশ্যই আছেন। কিন্তু যে নাস্তিক তার দৃষ্টিতে তাহার ভিতর তো তিনি নাই। ইহা যদি ভগবানের চমৎকারিত্ব না হয়, তবে ইহাকে আর কি বলিব ?

যেরূপ সর্ব্বত্র বিচরণশীল মহান্ বায়ু নিত্য আকাশে বিদ্যমান আছে, ঐরূপ সকল প্রাণী আমাতে আছে এরূপ জানিবা। ৬

হে কৌন্তেয়! সকল প্রাণী কল্পের অন্তে আমার প্রকৃতিতে লয় পায়, এবং

কল্পের আরম্ভ হইলে আমি তাহাদিগকে পুনরায় সৃজন করি। ৭

আমার মায়ার সাহায্যে আমি এই প্রকৃতির প্রভাবের অধীন সকল প্রাণীকে বারংবার উৎপন্ন করি। ৮

হে ধনঞ্জয়! এই কর্ম্ম আমাকে বন্ধন করে না, কারণ আমি তাহাদের সম্বন্ধে উদাসীনের মত ও আসক্তিরহিত থাকি। ৯

আমার অধীন রহিয়া প্রকৃতি স্থাবর ও জঙ্গম জগৎ উৎপন্ন করে এবং এই কারণ হে কৌন্তেয়! জগৎ চক্রের ন্যায় ঘুরিতেছে (অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইতেছে।) ১০

প্রাণীমাত্রের মহেশ্বরস্বরূপ আমার তত্ত্বকে না জানিয়া মূর্খলোকে মানবদেহধারী আমাকে অবজ্ঞা করে। ১১

টিপ্পনী—কারণ যাহারা ঈশ্বরের সত্তা মানে না, তাহারা শরীরস্থিত অন্তর্যামীকে চেনে না এবং তাহার অস্তিত্বকে না মানিয়া জড়বাদী রহিয়া যায়।

ব্যর্থ আশাসম্পন্ন, ব্যর্থ কর্ম্মপরায়ণ, ব্যর্থ জ্ঞানযুক্ত মূঢ় লোকে মোহজনক রাক্ষসী অথবা আসুরী প্রকৃতির আশ্রয় লইয়া থাকে। ১২

হে পার্থ! ইহার বিপরীত, মহাত্মাগণ দৈবী প্রকৃতির আশ্রয় লইয়া, প্রাণীমাত্রের আদি কারণ এরূপ অবিনাশী আমাকে জানিয়া একনিষ্ঠভাবে আমার ভজনা করে। ১৩

দৃঢ়চিত্ত যত্নশীল ব্যক্তিরা নিরন্তর আমার কীর্ত্তন করে, ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে

নমস্কার করে এবং নিত্য ধ্যান দ্বারা আমার উপাসনা করে। ১৪

এবং অপর কেহ কেহ অদ্বৈতরূপে অথবা দ্বৈতরূপে অথবা বহুরূপে সর্ব্বব্যাপী আমাকে জ্ঞান দ্বারা উপাসনা করে। ১৫

যজ্ঞের সংকল্প আমি, যজ্ঞ আমি, যজ্ঞ দ্বারা পিতৃগণের আধার আমি, যজ্ঞের বনস্পতি আমি, মন্ত্র আমি, আহুতি আমি, অগ্নি এবং হবন দ্রব্য আমি। ১৬

এই জগতের পিতা আমি, মাতা আমি, ধারণকর্ত্তা আমি, পিতামহ আমি, জ্ঞেয় আমি, পবিত্র ওঁকার আমি, ঋক্‌বেদ, সামবেদ ও যজুর্ব্বেদও আমি। ১৭

গতি আমি, পোষক আমি, প্রভু আমি, সাক্ষী আমি, নিবাস আমি, আশ্রয় আমি,

হিতেচ্ছু আমি, উৎপত্তি আমি, নাশ আমি, স্থিতি আমি, ভাণ্ডার আমি, এবং অব্যয় বীজও আমি। ১৮

আমি উত্তাপ দি, বর্ষাকেও আমি বর্ষণ করি ও অবরোধ করি। অমরতা আমি, মৃত্যু আমি এবং হে অর্জ্জুন! সৎ এবং অসৎও আমি। ১৯

তিন বেদবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানকারীরা সোমরস পান করিয়া নিষ্পাপ হইয়া যজ্ঞ দ্বারা আমার পূজা করিয়া স্বর্গ যাচ্ঞা করে। তাহারা পবিত্র দেবলোকে পৌঁছিয়া দিব্য সুখ ভোগ করে। ২০

টিপ্পনী—বৈদিক ক্রিয়া সকল ফলপ্রাপ্তির জন্য অনুষ্ঠিত হইত এবং তাহাদের মধ্যের কয়েকটি ক্রিয়ায় সোমরসপান করা হইত, এখানে সেই

কথার উল্লেখ আছে। এই ক্রিয়া কি ছিল, সোমরস কি ছিল, তাহা এখন ঠিক ঠিক কেহ বলিতে পারে না।

এই বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করিয়া পুণ্য ক্ষীণ হইলে তাহারা মৃত্যুলোকে ফিরিয়া আসে। এই প্রকারে বৈদিক কর্ম্মের অনুষ্ঠানকারীরা, ফলেচ্ছাকারীরা জন্ম-মৃত্যুর ফেরে (চক্রে) পড়ে। ২১

যাহারা অনন্যভাবে আমার চিন্তন করিতে করিতে আমার ভজনা করে, নিত্য আমাতে রত তাহাদের যোগক্ষেমের ভার আমি লইয়া থাকি। ২২

টিপ্পনী—এই প্রকার যোগীকে চেনার তিনটি সুন্দর লক্ষণ আছে—সমত্ব, কর্ম্মকৌশল, অনন্য ভক্তি। এই তিনটি পরস্পর ওতপ্রোতভাবে

থাকা চাই। ভক্তি বিনা সমত্ব লাভ হয় না, সমত্ব বিনা ভক্তি মিলে না, আর কর্ম্মকৌশল বিনা ভক্তি ও সমত্ব লাভ না হওয়ারই আশঙ্কা। যোগ অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বস্তু সংগ্রহ করা এবং ক্ষেম অর্থাৎ প্রাপ্ত বস্তু সংরক্ষণ।

আর হে কৌন্তেয়। যাহারা শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক অপর দেবতাদের ভজন করে, বিধি বিহীন হইলেও, তাহারা আমাকেও ভজনা করে। ২৩

টিপ্পনী—বিধি বিহীন অর্থাৎ অজ্ঞানতার জন্য আমাকে নিরাকার নিরঞ্জন না জানিয়া।

আমিই সকল যজ্ঞের ভোক্তা প্রভু। এরূপ আমাকে তাহারা প্রকৃত স্বরূপে জানে না; এ জন্য তাহাদের পতন হয়। ২৪

দেবতাদের পূজাকারীরা দেবলোক পায়,

পিতৃপুরুষের পূজাকারীরা পিতৃলোক পায়, ভূতপ্রেতাদির পূজাকারীরা ভূতপ্রেতলোক পায়, আর আমার পূজাকারীরা আমাকে পায়। ২৫

টিপ্পনী—অর্থাৎ ঈশ্বর প্রীত্যর্থে যাহা কিছু সেবা ভাবে দেওয়া যায়, সেই সেই প্রাণীতে অবস্থিত অন্তর্যামী ভগবানই তাহা গ্রহণ করেন।

পত্র, ফুল, ফল অথবা জল যে আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক অর্পণ করে, প্রযত্নশীল মানুষ দ্বারা ভক্তির সহিত অর্পিত বলিয়া আমি তাহা সেবন করি। ২৬

এ জন্য হে কৌন্তেয়! যাহা করিবে, যাহা খাইবে, যাহা হবন করিবে, যাহা দান করিবে, যে তপ করিবে, সে সবই আমাকে অর্পণ করিয়া করিবে। ২৭

ইহাতে তুমি শুভাশুভ ফলদানকারী কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে, এবং ফলত্যাগ-রূপ সমত্ব প্রাপ্ত হইয়া জন্মমরণ হইতে মুক্ত হইয়া আমাকে পাইবে। ২৮

সকল প্রাণীমধ্যে আমি সমভাবে আছি। কেহই আমার অপ্রিয় অথবা প্রিয় নহে। যাহারা ভক্তিপূর্ব্বক আমার ভজনা করে, তাহারা আমার ভিতর আছে এবং আমিও তাহাদের ভিতর আছি। ২৯

অতি দুরাচারী ব্যক্তিও যদি অনন্যভাবে আমার ভজনা করে, তবে তাহাকে সাধু বলিয়া মানা চাই, কারণ এখন তাহার সংকল্প উত্তম। ৩০

টিপ্পনী—কারণ অনন্যভক্তি দুরাচারকে শান্ত করিয়া দেয়।

এই ব্যক্তি শীঘ্রই ধর্ম্মাত্মা হইয়া যায় এবং নিরন্তর শান্তি পায়। হে কৌন্তেয়! তুমি নিশ্চয়পূর্ব্বক জানিও যে, আমার ভক্তের কখনও নাশ হয় না। ৩১

পুনরায় হে পার্থ! যাহারা পাপযোনি সম্ভূত তাহারা এবং স্ত্রী, বৈশ্য তথা শূদ্র যাহারা আমার আশ্রয় গ্রহণ করে তাহারাও পরমগতি পায়। ৩২

তবে যে সব পুণ্যবান ব্রাহ্মণ এবং রাজর্ষি আমার ভক্ত, তাহাদের কথা কি কহিব? এজন্য এই অনিত্য ও সুখরহিত লোকে জন্ম লইয়া তুমি আমাকে ভজনা কর। ৩৩

আমাতে মন রাখ, আমার ভক্ত হও, আমার নিমিত্ত যজ্ঞ কর, আমাকে নমস্কার

কর অর্থাৎ আমাপরায়ণ হইয়া নিজেকে আমার সহিত যুক্ত করিয়া তুমি আমাকেই পাইবে। ৩৪

ওঁ তৎ সৎ

এই প্রকারে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপ উপনিষদ অর্থাৎ ব্রহ্ম-বিদ্যান্তর্গত যোগশাস্ত্রের শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে রাজবিদ্যা রাজগুহ্যযোগ নামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

দশম অধ্যায়

বিভূতিযোগ

সাত আট ও নয়এর অধ্যায়ে ভক্তি আদি নিরূপণ করার পর, ভগবান আপনার অনন্ত বিভূতির যৎকিঞ্চিৎ ভক্তকে দেখাইতেছেন।

শ্রীভগবান কহিলেন—

হে মহাবাহো! পুনরায় আমার উৎকৃষ্ট বচন শুন। প্রিয়জন তোমাকে তোমার হিতের জন্য ইহা কহিব। ১

দেব এবং মহর্ষিরা আমার উৎপত্তি জানে না, কারণ আমিই দেবতা ও মহর্ষিদের সব প্রকারেই আদিকারণ। ২

মৃত্যুলোকে থাকিয়া যে জ্ঞানী লোক-মহেশ্বর আমাকে জন্মরহিত ও অনাদিরূপে

জানে, সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া যায়। ৩

বুদ্ধি, জ্ঞান, অমূঢ়তা, ক্ষমা, সত্য, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, শান্তি, সুখ, দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু, ভয়, অভয়, অহিংসা, সমতা, সন্তোষ, তপ, দান, যশ, অপযশ প্রাণীদের এই প্রকার ভিন্ন ভিন্ন ভাব আমা হইতে উৎপন্ন হয়। ৪-৫

সপ্তর্ষি, তাহাদের পূর্ব্বে সনকাদি চার এবং (চৌদ্দ) মনু আমার সংকল্প হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং তাহাদের দ্বারা এই লোকে প্রজাসমূহ উৎপন্ন হইয়াছে। ৬

আমার এই বিভূতি আর শক্তিকে যে যথার্থভাবে জানে, সে নিঃসন্দেহ অবিচল সমত্ব লাভ করে। ৭

আমি সকলের উৎপত্তির কারণ এবং আমা হইতে সমস্ত প্রবর্ত্তিত হয়—ইহা জানিয়া জ্ঞানী ব্যক্তিরা ভাবযুক্ত হইয়া আমাকে ভজনা করে। ৮

আমাতে যাহারা চিত্ত লাগাইয়াছে, আমাকে যাহারা প্রাণ সমর্পণ করিয়াছে, তাহারা পরস্পর জ্ঞান দিতে দিতে এবং আমার গুণকীর্ত্তন করিতে করিতে সন্তোষ ও আনন্দ পায়। ৯

এরূপে যাহারা আমাতে তন্ময় থাকে এবং প্রেমপূর্ব্বক আমার ভজনা করে তাহা-দিগকে আমি জ্ঞানদান করি এবং তাহাতে তাহারা আমাকে পায়। ১০

তাহাদের হৃদয়স্থিত আমি তাহাদের প্রতি দয়া করিয়া জ্ঞানরূপ দীপ্তিশীল আলো

দ্বারা তাহাদের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার নাশ করি। ১১

অর্জ্জুন কহিলেন—

হে ভগবান! তুমি পরমব্রহ্ম, পরম ধাম, পরম পবিত্র। সকল ঋষি, দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল, এবং ব্যাস তোমাকে অবিনাশী, দিব্যপুরুষ, আদিদেব, জন্মরহিত ও ঈশ্বররূপ বলে এবং তুমি নিজেও এরূপ কহিতেছ। ১২-১৩

হে কেশব! তুমি যাহা বলিতেছ তাহা আমি সত্য বলিয়া মানি। হে ভগবান! তোমার স্বরূপকে না জানে দেব—না জানে দানব। ১৪

হে পুরুষোত্তম! হে জীবপিতা! হে

জীবেশ্বর! হে দেবদেব! হে জগতস্বামী! তুমি নিজেই নিজের দ্বারা নিজেকে জান।

১৫

যে বিভূতিদ্বারা তুমি এই সব লোকে ব্যপ্ত হইয়া আছ, তোমার ঐ বিভূতির কথা আমাকে পূর্ণরূপে বলা উচিত। ১৬

হে যোগী! নিত্য কিভাবে চিন্তা করিলে তোমাকে চিনিতে সক্ষম হইব? হে ভগবান কি-কি রূপে তোমার চিন্তন করা দরকার?

১৭

হে জনার্দ্দন! তোমার শক্তি ও বিভূতির বর্ণন আমার নিকট বিস্তার-পূর্ব্বক আবার কর। তোমার অমৃতময় বাণী শুনিয়া আমার তৃপ্তি হইতেছে না। ১৮

শ্রীভগবান কহিলেন—

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! আমার মুখ্য মুখ্য দিব্য বিভূতির কথা তোমাকে কহিব। তাহাদের বিস্তারের অন্ত তো নাই-ই। ১৯

হে গুড়াকেশ! (জিতনিদ্র!) আমি সব প্রাণীর হৃদয়ে বিদ্যমান আত্মা। আমি ভূতমাত্রের আদি মধ্য ও অন্ত। ২০

আদিত্যগণের মধ্যে বিষ্ণু আমি, জ্যোতিষ্কদের মধ্যে সমুজ্জ্বল সূর্য্য আমি, বায়ুগণের মধ্যে মরীচি আমি, নক্ষত্রগণের মধ্যে চন্দ্র আমি। ২১

বেদের মধ্যে সামবেদ আমি, দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র আমি, ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে মন আমি, প্রাণীগণের মধ্যে চেতনা আমি। ২২

রুদ্রগণের মধ্যে শঙ্কর আমি, যক্ষ ও

রাক্ষসগণের মধ্যে কুবের আমি, বসুগণের মধ্যে অগ্নি আমি, পর্ব্বত মধ্যে মেরু আমি। ২৩

হে পার্থ! পুরোহিত মধ্যে প্রধান বৃহস্পতি আমি। সেনাপতিদের মধ্যে কার্ত্তিক আমি এবং সরোবরের মধ্যে সাগর আমি। ২৪

মহর্ষিদের মধ্যে ভৃগু আমি, বাক্যের মধ্যে একাক্ষর ওঁ আমি, যজ্ঞের মধ্যে জপ-যজ্ঞ আমি এবং স্থাবরের মধ্যে হিমালয় আমি। ২৫

বৃক্ষসকলের মধ্যে অশ্বত্থ আমি, দেবর্ষিদের মধ্যে নারদ আমি, গন্ধর্বদের মধ্যে চিত্ররথ আমি এবং সিদ্ধদের মধ্যে কপিল মুনি আমি। ২৬

অশ্বের মধ্যে অমৃতমন্থনের সময় উৎপন্ন উচ্চৈঃশ্রবা বলিয়া আমাকে জানিও। হাতীর মধ্যে ঐরাবত এবং মানুষের মধ্যে রাজা আমি। ২৭

হাতিয়ারের মধ্যে বজ্র আমি, গাভীর মধ্যে কামধেনু আমি, প্রজা উৎপত্তির কারণ কামদেব আমি, সর্পের মধ্যে বাসুকী আমি। ২৮

নাগগণের মধ্যে শেষনাগ আমি, জলচরের মধ্যে বরুণ আমি, পিতৃগণের মধ্যে অর্য্যমা আমি এবং দণ্ডদানকারীর মধ্যে যম আমি। ২৯

দৈত্য মধ্যে প্রহ্লাদ আমি, গনণাকারী-দের মধ্যে কাল আমি, পশুদের মধ্যে সিংহ আমি, পক্ষীদের মধ্যে গরুড় আমি। ৩০

পবিত্রকারীদের মধ্যে পবন আমি, শস্ত্রধারীদের মধ্যে পরশুরাম আমি, মৎস্য মধ্যে মকর এবং নদী মধ্যে গঙ্গা আমি। ৩১

হে অর্জ্জুন! সৃষ্টির আদি অন্ত ও মধ্য আমি। বিদ্যার মধ্যে অধ্যাত্ম বিদ্যা আমি এবং বাদ-বিবাদ কারীদের মধ্যে বাদ আমি। ৩২

অক্ষর মধ্যে অকার আমি, সমাস মধ্যে দ্বন্দ্ব আমি, অবিনাশী কাল আমি এবং সর্ব্বব্যাপী ধাতাও আমি। ৩৩

সকলকে হরণকারী মৃত্যু আমি, ভাবী বস্তু সকলের উৎপত্তির কারণ আমি এবং নারীজাতির কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, বাণী, স্মৃতি, মেধা (বুদ্ধি), ধৃতি (ধৈর্য্য) ও ক্ষমা আমি। ৩৪

সামের মধ্যে বৃহৎ (বড়) সাম আমি, ছন্দ মধ্যে গায়ত্রী আমি, মাসের মধ্যে অগ্রহায়ণ আমি, ঋতু মধ্যে বসন্ত আমি। ৩৫

ছলনাকারীদের দ্যূত আমি, প্রতাপশালীর প্রভাব আমি, জয়শীলদের জয় আমি, নিশ্চয় আমি, সাত্ত্বিক ভাবাপন্নদের সত্ত্ব আমি। ৩৬

টিপ্পনী –ছলনাকারীদের দ্যূত আমি—এ কথা দেখিয়া ভড়কাইবার আবশ্যকতা নাই। এখানে সারাসার নির্ণয়ের কথা নাই, কিন্তু সংসারে যাহা কিছু ঘটিতেছে তাহা ঈশ্বরের আজ্ঞা বিনা হয় না ইহাই বলা হইতেছে। যে কপটী ইহা জানে যে, সংসারের সমস্তই ভগবানের আজ্ঞাধীন, সেও অভিমান ত্যাগ করিয়া ছলনা ত্যাগ করে।

বৃষ্ণিকুলে বাসুদেব আমি, পাণ্ডবদের

মধ্যে ধনঞ্জয় আমি, মুনিদের মধ্যে ব্যাস আমি এবং কবিদের মধ্যে উশনা আমি। ৩৭

শাসনকর্ত্তার দণ্ড আমি, জয়েচ্ছুদের নীতি আমি, গুহ্যকথার মৌন আমি এবং জ্ঞানবানের জ্ঞান আমি। ৩৮

হে অর্জ্জুন! সমস্ত প্রাণীর উৎপত্তির কারণ আমি। যাহা কিছু স্থাবর অথবা জঙ্গম তাহা আমা ছাড়া নাই। ৩৯

হে পরন্তপ! আমার দিব্য বিভূতি-সমূহের অন্ত নাই। বিভূতি সকলের এই বিস্তার আমি কেবল দৃষ্টান্তস্বরূপ বলিয়াছি। ৪০

যাহা কিছু বিভূতিযুক্ত, লক্ষ্মীবান অথবা প্রভাবশালী তাহা আমার তেজের অংশ-সম্ভূত জানিও। ৪১

অথবা হে অর্জ্জুন। ইহা বিস্তারপূর্ব্বক জানিয়া তুমি কি করিবে? আমার এক অংশমাত্রে আমি এই সমগ্র জগৎ ধারণ করিয়া বিদ্যমান আছি। ৪২

ওঁ তৎ সৎ

এই প্রকারে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপ উপনিষদ অর্থাৎ ব্রহ্ম-বিদ্যান্তর্গত যোগশাস্ত্রের শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে বিভূতিযোগ নামক দশম অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

একাদশ অধ্যায়

বিশ্বরূপদর্শনযোগ

এই অধ্যায়ে ভগবান আপনার বিরাট স্বরূপ অর্জ্জুনকে দেখাইতেছেন। এই অধ্যায় ভক্তের অতি প্রিয়। ইহাতে যুক্তি-প্রমাণ নাই, আছে কেবল কাব্য। ইহা পাঠ করিতে গিয়া মানুষ ক্লান্ত হয় না।

অর্জ্জুন বলিলেন—

তুমি আমার উপর কৃপা করিয়া এই আধ্যাত্মিক পরম রহস্য কহিলে। তুমি আমাকে যে কথা বলিলে, তাহাতে আমার এই মোহ দূর হইয়া গিয়াছে। ১

প্রাণীদের উৎপত্তি এবং নাশ সম্বন্ধে আমি তোমার নিকট বিস্তার পূর্ব্বক

শুনিয়াছি। ঐ প্রকার হে কমলপত্রাক্ষ! তোমার অবিনাশী মাহাত্ম্যের কথাও শুনিয়াছি। ২

হে পরমেশ্বর! তুমি তোমার যেরূপ পরিচয় দিলে তাহা ঐরূপই। হে পুরুষোত্তম! তোমার ঐ ঈশ্বরীয় রূপ দেখার ইচ্ছা আমার হইয়াছে। ৩

হে প্রভো! হে যোগেশ্বর! উহা দর্শন করিতে আমাকে সক্ষম মনে করিলে ঐ অব্যয় রূপ দর্শন করাও। ৪

শ্রীভগবান কহিলেন—

হে পার্থ! আমার শত শত এবং হাজার হাজার রূপ দেখ। তাহা অনেক প্রকারের, দিব্য, পৃথক পৃথক রংএর ও আকারের। ৫

হে ভারত! আদিত্য, বসু, রুদ্র, দুই অশ্বিনী এবং মরুতদিগকে দেখ। পূর্ব্বে কখনও দেখ নাই, এরূপ বহু আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখ। ৬

হে গুড়াকেশ! (জিতনিদ্র!) এখানে আমার শরীরমধ্যে একরূপে স্থিত সমুদয় স্থাবর ও জঙ্গম জগৎ এবং আর যাহা কিছু দেখিতে চাও, তাহা আজ দেখিয়া লও। ৭

চর্ম্ম চক্ষু দ্বারা তুমি আমাকে দেখিতে সক্ষম হইবে না। তোমাকে আমি দিব্য চক্ষু দিব। তুমি আমার ঈশ্বরীয় যোগ দেখ। ৮

সঞ্জয় কহিলেন—

হে রাজন! যোগেশ্বর কৃষ্ণ এরূপ কহিয়া পার্থকে আপনার পরম ঈশ্বরীয় রূপ দেখাইলেন। ৯

তাহা অনেক মুখ-ও আখি-যুক্ত অনেক অদ্ভুত দর্শন, অনেক দিব্য-ভূষণধারী এবং অনেক দিব্য উদ্যত শস্ত্রধারী। ১০

তিনি অনেক দিব্য মালা ও বস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন, দিব্য গন্ধ অনুলিপ্ত ছিলেন। তিনি সর্ব্ব প্রকারে অশ্চর্য্যময়, অনন্ত ও সর্ব্বব্যাপী দেবতা ছিলেন। ১১

আকাশে এক কালে হাজার সূর্য্যের তেজ প্রকাশিত হইলে তাহা কদাচিৎ ঐ মহাত্মার তেজের ন্যায় হইতে পারে। ১২

ওখানে ঐ দেবাদিদেবের শরীরে পাণ্ডব অনেক প্রকারে বিভক্ত সমগ্র জগৎ একরূপে স্থিত দেখিলেন। ১৩

আশ্চর্য্যচকিত ও রোমাঞ্চিত হইয়া

ধনঞ্জয় পুনরায় মাথা নোয়াইলেন এবং হাত যোড় করিয়া এই প্রকার বলিলেন। ১৪

অর্জ্জুন কহিলেন—

হে দেব! তোমার দেহে আমি দেবতাদিগকে, ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের সকল প্রাণীকে, কমলাসনে বিরাজিত প্রভু ব্রহ্মাকে, সমস্ত ঋষিকে তথা দিব্য সর্পকে দেখিতেছি। ১৫

তোমার অনেক বাহু, অনেক উদর, অনেক মুখ ও অনেক চোখ দেখিতেছি। তোমাকে অনন্তরূপযুক্ত দেখিতেছি। তোমার অন্ত নাই, মধ্য নাই আদিও নাই। হে বিশ্বেশ্বর! তোমার বিশ্বরূপ আমি দর্শন করিতেছি। ১৬

মুকুটধারী, গদাধারী, চক্রধারী,

তেজোময়, সর্ব্বদিকে উজ্জ্বল কিরণ বিকিরণকারী, দর্শনদুষ্কর, অপ্রমেয়, প্রজ্জ্বলিত অগ্নি কিংবা সূর্য্যের সমান সব দিকে দেদীপ্যমান তোমাকে আমি দেখিতেছি। ১৭

তোমাকে আমি জানার যোগ্য পরম অক্ষররূপ, এই জগতের অন্তিম আধার, সনাতনধর্ম্মের অবিনাশী রক্ষক এবং সনাতন পুরুষ মনে করি। ১৮

যাহার আদি, মধ্য অথবা অন্ত নাই, যাহার শক্তি অনন্ত, যাহার বাহু অনন্ত, যাহার সূর্য্যচন্দ্ররূপ নেত্র আছে, যাহার মুখ প্রজ্জ্বলিত অগ্নির সমান আর যে নিজের তেজে এই জগৎকে তপ্ত করিতেছে, আমি তোমার সেইরূপ দেখিতেছি। ১৯

আকাশ ও পৃথিবীর এই ব্যবধানে এবং সমস্ত দিকে একাকী তুমিই ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছ, হে মহাত্মন! তোমার এই অদ্ভুত উগ্ররূপ দেখিয়া ত্রিলোক থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। ২০

আর এই দেবতাদের সংঘ তোমার ভিতরে প্রবেশ করিতেছে। ভয়ভীত হইয়া কত জন হাত যোড় করিয়া তোমার স্তব করিতেছে। মহর্ষি ও সিদ্ধগণ সকলে '(জগতের) কল্যাণ হউক' ইহা কহিয়া অনেক প্রকারে তোমার যশ কীর্ত্তন করিতেছে। ২১

রুদ্র, আদিত্য, বসু, সাধ্যগণ, বিশ্বদেব, অশ্বিনীকুমার, মরুত, উষ্মপানকারী পিতৃগণ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অসুর এবং সিদ্ধগণের সংঘ

সকল বিস্মিত হইয়া তোমাকে দেখিতেছে।
২২

হে মহাবাহো! অনেক মুখ ও নেত্র-যুক্ত, অনেক হস্ত-জঙ্ঘা-পদ ও উদর বিশিষ্ট, বহুদন্তবিশিষ্ট করালদর্শন তোমার বিশ্বরূপ দেখিয়া সমস্ত সংসার ভীত হইয়া পড়িয়াছে। আমিও ভীত হইয়া পড়িয়াছি। ২৩

গগনস্পর্শী, দীপ্তিমান, নানা বর্ণবিশিষ্ট, বিস্তারিত মুখমণ্ডল এবং বিশালরূপ তোমাকে দেখিয়া হে বিষ্ণু! আমার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে এবং আমি ধৈর্য্য ও মনের শান্তি রক্ষা করিতে পারিতেছি না। ২৪

দন্তদ্বারা ভীষণ প্রলয়াগ্নি সম তোমার

মুখ দেখিয়া আমি দিশাহারা হইতেছি, আমার শান্তি মিলিতেছে না, হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! তুমি প্রসন্ন হও। ২৫

সকল রাজার সহিত ধৃতরাষ্ট্রের এই সব পুত্র, ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য, সূতপুত্র কর্ণ এবং আমাদের মুখ্য যোদ্ধাগণ করাল দর্শন তোমার মুখে বেগে প্রবেশ করিতেছে। কতজনের মস্তক চূর্ণ হইয়া তোমার দাঁতের ফাঁকে লাগিয়া রহিয়াছে দেখা যাইতেছে। ২৬-২৭

যে প্রকার নদীসমূহের বড় প্রবাহ সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হয়, ঐ প্রকার এই সব লোকনায়ক তোমার প্রজ্জ্বলিত মুখে প্রবেশ করিতেছে। ২৮

নিজের বিনাশের নিমিত্ত পতঙ্গ যে

প্রকার ক্রমবর্দ্ধমান বেগে জ্বলন্ত অগ্নিতে ঝাঁপাইয়া পড়ে, ঐ প্রকার সমস্ত জগৎ ক্রমবর্দ্ধমান বেগে তোমার মুখে প্রবেশ করিতেছে। ২৯

সমগ্র সৃষ্টিকে সকল দিক হইতে তুমি তোমার প্রজ্জ্বলিত মুখ দিয়া লেহন করিতেছ। হে সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণু! তোমার উগ্র প্রকাশ সমগ্র জগৎকে তেজদ্বারা পূর্ণ এবং পরিতপ্ত করিতেছে। ৩০

উগ্ররূপ তুমি কে তাহা আমাকে বল। হে দেবশ্রেষ্ঠ! তুমি প্রসন্ন হও। আদি কারণ তোমাকে আমি জানিতে চাহিতেছি। তোমার প্রবৃত্তি আমি জানি না। ৩১

শ্রীভগবান কহিলেন—

লোকক্ষয়কারী মহাবল কাল আমি

লোক সমুদয় ধ্বংস করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি। প্রত্যেক সৈন্যদলে এই যে-সব সৈন্য আসিয়াছে, তুমি যুদ্ধ করিতে অস্বীকার করিলেও, তাহাদের কেহই রক্ষা পাইবে না। ৩২

অতএব তুমি (যুদ্ধার্থ উঠিয়া) দাঁড়াও, কীর্ত্তিলাভ কর, শত্রুকে জয় করিয়া ধনধান্য-পূর্ণ রাজ্য ভোগ কর। আমি পূর্ব্ব হইতেই ইহাদিগকে বধ করিয়া রাখিয়াছি। হে সব্যসাচী! তুমি তো কেবল নিমিত্ত মাত্র।৩৩

দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ এবং অন্যান্য যোদ্ধাকে আমি হত্যা করিয়াছি। তাহা-দিগকে তুমি বিনাশ কর। ভয় করিও না, যুদ্ধ কর, শত্রুকে তুমি রণে পরাস্ত করিবে। ৩৪

সঞ্জয় কহিলেন—

কেশবের এই কথা শুনিয়া, হাত যোড় করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে, বারংবার নমস্কার করিতে করিতে, ভয়ে ভয়ে প্রণাম করিয়া মুকুটধারী অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের নিকট গদগদ কণ্ঠে এই প্রকার কহিলেন। ৩৫

অর্জ্জুন কহিলেন—

হে হৃষিকেশ! তোমার গুণ কীর্ত্তন করিয়া জগৎ হর্ষলাভ করে এবং তোমার সম্বন্ধে যে অনুরাগ উৎপন্ন হয় তাহাও যুক্তিযুক্ত। ভয়ভীত রাক্ষসগণ এদিক ওদিক পলায়ন করে এবং সিদ্ধগণ সকলে তোমাকে নমস্কার করে। ৩৬

হে মহাত্মন! তাহারা কেন তোমাকে নমস্কার করিবে না? তুমি ব্রহ্মা অপেক্ষাও মহৎ আদি কর্ত্তা। হে অনন্ত! হে দেবেশ!

হে জগন্নিবাস! তুমি অক্ষর, তুমি সৎ, তুমি অসৎ এবং ইহাদের অতীত যাহা তাহাও তুমি। ৩৭

তুমি আদি দেব। তুমি পুরাতন পুরুষ। তুমি এই বিশ্বের পরম আশ্রয়স্থান। তুমি জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়। তুমি পরম ধাম। হে অনন্তরূপ! তুমি এই জগতে ব্যপ্ত হইয়া আছ। ৩৮

তুমিই বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র, প্রজাপতি প্রপিতামহ। তোমাকে হাজার-বার নমস্কার করি। পুনরায় তোমাকে নমস্কার করি। ৩৯

হে সর্ব্বস্বরূপ! তোমাকে সম্মুখ, পশ্চাৎ এবং সব দিক হইতে নমস্কার করিতেছি। তোমার বীর্য্য অনন্ত, শক্তি অপার, সব-কিছু

তুমিই ধারণ করিয়া আছ। এজন্য তুমিই জগতের সর্ব্ব। ৪০

মিত্রভাবে এবং তোমার মহিমা না জানিয়া হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখা! এই প্রকার সম্বোধন করিয়া আমি ভুল করিয়াছি অথবা প্রেমবশে যাহা অন্যায় করিয়াছি এবং পরিহাস ছলে, খেলিতে, শুইতে, বসিতে, খাইতে অর্থাৎ অন্যের সমক্ষে আমার দ্বারা তোমার যাহা কিছু অপমান হইয়াছে, তাহা ক্ষমা করার জন্য তোমার নিকট মিনতি করিতেছি। ৪১-৪২

স্থাবর জঙ্গম জগতের পিতা তুমি। তুমি তাহাদের পূজ্য এবং শ্রেষ্ঠ গুরু। তোমার সমানই কেহ নাই, তবে তোমার অপেক্ষা বড় কিরূপে হইতে পারে? তিন

লোকে তোমার সামর্থ্যের তুলনা নাই। ৪৩

এজন্য ষাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া পূজনীয় ঈশ্বর তোমাকে প্রসন্ন হওয়ার জন্য প্রার্থনা করিতেছি। হে দেব! যে প্রকার পিতা পুত্রের, সখা সখার ত্রুটী সহ্য করে, ঐ প্রকার তুমি আমার প্রিয় হওয়ার দরুণ, আমার কল্যাণের জন্য আমার অপরাধ ক্ষমা কর। ৪৪

পূর্ব্বে যাহা দেখি নাই, তোমার সেরূপ মূর্ত্তি দেখিয়া আমার রোমাঞ্চ হইতেছে এবং ভয়ে আমার মন ব্যাকুল হইয়াছে। অতএব হে দেব! তোমার পূর্ব্বের রূপ দেখাও। হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! তুমি প্রসন্ন হও। ৪৫

মুকুট-গদা-চক্রধারী তোমার পূর্ব্বরূপ দেখিতে ইচ্ছা করিতেছি। হে সহস্রবাহো! হে বিশ্বমূর্ত্তি! তোমার চতুর্ভুজ রূপ ধারণ কর। ৪৬

শ্রীভগবান কহিলেন—

হে অর্জ্জুন! তোমার উপর প্রসন্ন হইয়া, তোমাকে আমি নিজের তেজোময় বিশ্বব্যাপী, অনন্ত পরম আদিরূপ দেখাইয়াছি। তুমি ভিন্ন অপর কেহ ইহা পূর্ব্বে দেখে নাই। ৪৭

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! বেদাভ্যাস দ্বারা, যজ্ঞ দ্বারা, অন্যান্য শাস্ত্র পাঠ দ্বারা, দান দ্বারা, ক্রিয়া কলাপ অথবা উগ্র তপস্যা দ্বারাও, তুমি ভিন্ন অপর কেহ আমার এই রূপ দেখিতে সমর্থ হয় নাই। ৪৮

আমার এই বিকট রূপ দেখিয়া তুমি

ঘাবড়াইও না, মোহাবিষ্ট হইও না। ভয় ত্যাগ করিয়া শান্তচিত্ত হও এবং পরিচিত আমার রূপ আবার দেখ। ৪৯

সঞ্জয় কহিলেন—

বাসুদেব অর্জ্জুনকে ইহা কহিয়া আপনার রূপ পুনরায় দেখাইলেন এবং ঐ মহাত্মা পুনরায় শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভয়ভীত অর্জ্জুনকে আশ্বাস দিলেন। ৫০

অর্জ্জুন কহিলেন—

আপনার এই সৌম্য মানবস্বরূপ দেখিয়া এখন আমি শান্ত ও প্রকৃতিস্থ হইলাম। ৫১

শ্রীভগবান কহিলেন—

তুমি আমার যে রূপ দেখিলে, তাহার দর্শনলাভ করা বহুত দুর্লভ। দেবতারাও এই রূপ দেখার জন্য ব্যস্ত বা উৎসুক হন। ৫২

তুমি আমার যে রূপ দর্শন করিলে, ইহা বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, দান অথবা যজ্ঞদ্বারা হইতে পারে না। ৫৩

পরন্তু হে অর্জ্জুন! হে পরন্তপ! আমার সম্বন্ধে এরূপ জ্ঞান, এরূপে আমাকে দর্শন ও আমাতে বাস্তবিক প্রবেশ কেবল অনন্য ভক্তি দ্বারাই সম্ভব। ৫৪

হে পাণ্ডব! যে ব্যক্তি সকল কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ করে, আমাপরায়ণ হয়, আমার ভক্ত হয়, আসক্তি ত্যাগ করে এবং প্রাণীমাত্রে দ্বেষরহিত হইয়া অবস্থান করে, সে আমাকে পায়। ৫৫

ওঁ তৎ সৎ

এই প্রকারে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপ উপনিষদ অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যান্তর্গত যোগশাস্ত্রের শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে বিশ্বরূপদর্শন যোগ নামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

দ্বাদশ অধ্যায়

ভক্তিযোগ

অনন্যভক্তি দ্বারাই পুরুষোত্তমকে দর্শন করা যায়, ভগবান কর্ত্তৃক ইহা কথিত হওয়ার পর ভক্তির স্বরূপ লোকের সম্মুখে উপস্থিত করা দরকার। এই অধ্যায়টি সকলের কণ্ঠস্থ করা উচিত। ইহা গীতার অন্যতম ক্ষুদ্র অধ্যায়। ইহাতে বর্ণিত ভক্তের লক্ষণ নিত্য মননযোগ্য।

অর্জ্জুন কহিলেন—

এই প্রকারে যে ভক্ত ধ্যান ধারণার সাহায্যে নিরন্তর তোমার (সাকার স্বরূপের) উপাসনা করে এবং যে তোমার অবিনাশী অব্যক্ত স্বরূপের ধ্যান করে,

তাহাদের ভিতর কোন্ যোগী শ্রেষ্ঠ গণ্য হয় ? ১

শ্রীভগবান কহিলেন—

নিত্য ধ্যানশীল যে ব্যক্তি আমাতে মন নিবিষ্ট করিয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আমার (সগুণ স্বরূপের) উপাসনা করে, তাহাকে আমি শ্রেষ্ঠ যোগী মনে করি। ২

সকল ইন্দ্রিয় বশে রাখিয়া, সর্ব্বত্র সমত্ব বা সমদৃষ্টি রাখিয়া যাহারা দৃঢ়, অচল, ধীর, অচিন্ত্য, সর্ব্বব্যাপী, অব্যক্ত, অবর্ণনীয়, অবিনাশী স্বরূপের উপাসনা করে, সেই সকল সর্ব্বহিতেরত লোকে আমাকে পায়। ৩-৪

অব্যক্তে (নির্গুণ ব্রহ্মে) আসক্ত ব্যক্তিগণের অধিক ক্লেশ হইয়া থাকে ; কারণ দেহধারী অতি কষ্টেই অব্যক্ত গতি

(নির্গুণ ব্রহ্মবিষয়ক নিষ্ঠা) লাভ করিতে পারে। ৫

টিপ্পনী—দেহধারী মানুষ অমূর্ত্ত স্বরূপের কেবল কল্পনাই করিতে পারে, কিন্তু তাহার নিকট অমূর্ত্ত স্বরূপ বুঝানর জন্য একটিও নিশ্চয়াত্মক শব্দ নাই, এ জন্য তাহাকে নিষেধাত্মক 'নেতি' শব্দের দ্বারা সন্তুষ্ট হইতে হয়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি মূর্ত্তি-পূজার নিষেধকারী, সেও সূক্ষ্মদৃষ্টিতে মূর্ত্তিপূজক। পুস্তকের পূজা করা, মন্দিরে গিয়া পূজা করা, একই দিকে মুখ রাখিয়া পূজা করা—এ সবই সাকার পূজার লক্ষণ। তথাপি সাকারের পরপারে নিরাকার অচিন্ত্য স্বরূপ আছেন, ইহা সকলে না বুঝিলে নিস্তার নাই। ভক্তির পরাকাষ্ঠা এই যে, ভক্ত ভগবানে বিলীন হইয়া যায় এবং শেষকালে কেবল এক অদ্বিতীয় অরূপ ভগবানই রহিয়া যান। কিন্তু সাকার দ্বারা সহজে

এই অবস্থায় পৌঁছা যায়। এজন্য নিরাকারে সিধা পৌঁছিবার মার্গ কষ্টসাধ্য বলা হইয়াছে।

পরন্তু হে পার্থ! যাহারা আমাপরায়ণ হইয়া, সকল কর্ম্ম আমাকে সমর্পণ করিয়া, একনিষ্ঠার সহিত ধ্যাননিরত হইয়া আমার আরাধনা করে, আমাতে সমর্পিতচিত্ত সেই ব্যক্তিগণকে মৃত্যুরূপ সংসার-সাগর হইতে আমি অতি শীঘ্র উদ্ধার করি। ৬-৭

তোমার মন ও বুদ্ধি আমাতে স্থির কর; তাহা হইলে ইহার (এ জন্মের) পর নিঃসংশয়ে আমাকে পাইবে। ৮

হে ধনঞ্জয়! যদি তুমি আমাতে তোমার মন স্থির করিতে অসমর্থ হও, তবে অভ্যাস-যোগ দ্বারা আমাকে লাভ করার ইচ্ছা কর। ৯

এরূপ অভ্যাস করিতেও যদি অসমর্থ হও, তবে কর্ম্মমাত্র আমাকে অর্পণ কর ; আর এই প্রকারে আমার জন্য কর্ম্ম করিতে করিতেও তুমি মোক্ষ পাইবে। ১০

টিপ্পনী—অভ্যাস অর্থাৎ চিত্তবৃত্তিনিরোধের সাধনা, জ্ঞান অর্থাৎ শ্রবণ মননাদি, ধ্যান অর্থাৎ উপাসনা। ইহাতে পরিণামে যদি কর্ম্মফল ত্যাগ না দেখা দেয়, তবে সে অভ্যাস অভ্যাস নয়, সে জ্ঞান জ্ঞান নয়, আর সে ধ্যান ধ্যান নয়।

এবং যদি আমার নিমিত্ত কর্ম্ম করিতেও তুমি অশক্ত হও, তবে আমারই শরণ লইয়া সংযতচিত্ত হইয়া সব কর্ম্মের ফল ত্যাগ কর। ১১

অভ্যাস মার্গ হইতে জ্ঞানমার্গ শ্রেয়স্কর ;

জ্ঞানমার্গ অপেক্ষা ধ্যানমার্গ শ্রেষ্ঠ; এবং ধ্যানমার্গ অপেক্ষা কর্ম্মফলত্যাগ শ্রেষ্ঠ; কারণ এই ত্যাগের অন্তে শীঘ্রই শান্তি লাভ হয়। ১২

যে ব্যক্তি প্রাণীমাত্রের প্রতি দ্বেষরহিত, সকলের মিত্র, দয়াবান, মমতারহিত, অহঙ্কারশূন্য, সুখদুঃখে সমান, ক্ষমাশীল, সদা সন্তুষ্ট, যোগযুক্ত, ইন্দ্রিয়নিগ্রহী এবং দৃঢ়নিশ্চয় এবং আমাতে নিজের বুদ্ধি ও মন অর্পণ করিয়াছে, আমার এরূপ ভক্ত আমার প্রিয়। ১৩-১৪

যাহা হইতে লোকে সন্তাপ পায় না, যে অন্য কোনো ব্যক্তি হইতে সন্তাপ প্রাপ্ত হয় না, যে ব্যক্তি হর্ষ, ক্রোধ, ঈর্ষা, ভয়, উদ্বেগ হইতে মুক্ত, সে আমার প্রিয়। ১৫

যে ইচ্ছারহিত, পবিত্র, দক্ষ, উদাসীন, ভয়ভাবনাশূন্য, যে সংকল্প মাত্র ত্যাগ করিয়াছে সে আমার ভক্ত, সে আমার প্রিয়। ১৬

যাহার হর্ষ হয় না, যে দ্বেষ করে না, দুশ্চিন্তা করে না, আশা রাখে না, যে শুভাশুভকে ত্যাগ করিয়াছে, ঐ ভক্তিপরায়ণ আমার প্রিয়। ১৭

শত্রু-মিত্র, মান-অপমান, শীত-উষ্ণ, সুখ-দুঃখ,—এই সকলের মধ্যে যে সমভাবে থাকে, যে আসক্তি ছাড়িয়াছে, যে নিন্দা এবং স্তুতিতে সমভাবে থাকে, যে মৌনী, যে যাহা পায় তাহাতেই সন্তুষ্ট, যাহার নিজের কোনো স্থান নাই, যে স্থিরচিত্ত এরূপ মুনি বা ভক্ত আমার প্রিয়। ১৮-১৯

যে আমাপরায়ণ থাকিয়া শ্রদ্ধার সহিত পূর্ব্বোক্ত এই পবিত্র অমৃতরূপ জ্ঞানের (ধর্ম্মামৃতের) অনুষ্ঠান করে, সে আমার অতিশয় প্রিয়। ২০

ওঁ তৎ সৎ

এই প্রকারে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপ উপনিষদ অর্থাৎ ব্রহ্ম-বিদ্যান্তর্গত যোগশাস্ত্রের শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে ভক্তিযোগ নামক দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগ

এই অধ্যায়ে শরীর ও শরীরীর ভেদ দেখান হইয়াছে।

শ্রীভগবান কহিলেন—

হে কৌন্তেয়! এই শরীরকে ক্ষেত্র বলে, এবং ইহাকে যে জানে তাহাকে তত্ত্ব-জ্ঞানী ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হয়। ১

আর হে ভারত! সমস্ত ক্ষেত্রে বা শরীরে স্থিত আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে। ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রজ্ঞের পার্থক্যের জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান, ইহাই আমার মত। ২

এই ক্ষেত্র কি, ইহা কিরূপ, ইহা কিরূপ

বিকারযুক্ত, ইহা কোথা হইতে আসিল এবং ক্ষেত্রজ্ঞ কে, তার শক্তি কি, তাহা আমার নিকট সংক্ষেপে শুন। ৩

বিবিধ ছন্দে, নানা প্রকার-রীতিতে যুক্তি প্রমাণদ্বারা সংশয়শূন্য ব্রহ্মসূচক বাক্যে ঋষিগণ এ বিষয় বিবৃত করিয়াছেন। ৪

পঞ্চ মহাভূত—অহঙ্কার, বুদ্ধি, প্রকৃতি, দশ ইন্দ্রিয়, এক মন, পাঁচ বিষয়, ইচ্ছাদ্বেষ, সুখদুঃখ, সংঘাত, চেতনশক্তি, ধৃতি—এই ইন্দ্রিয়াদির বিকারযুক্ত ক্ষেত্রের কথা সংক্ষেপে বলিলাম। ৫-৬

টিপ্পনী—মহাভূত পাঁচপ্রকার—পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ। শরীর সম্বন্ধে বিদ্যমান অহংভাবই অহঙ্কার। অব্যক্ত অর্থাৎ অদৃশ্য মায়া, প্রকৃতি। দশটি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়—

নাসিকা, কর্ণ, চক্ষু, জিহ্বা ও ত্বক। পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়—হাত, পা, মুখ আর দুই গুহ্যেন্দ্রিয়। পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পাঁচটি বিষয়—শোঁকা, শুনা দেখা, চাখা আর ছোয়া। সংঘাতের অর্থ শরীরের তত্ত্বের পরস্পর সহকারিতা করার শক্তি। ধৃতি অর্থাৎ ধৈর্য্যরূপ সূক্ষ্মগুণ নয়, কিন্তু এই শরীরের পরমাণুদের একের অপরের সহিত লাগিয়া থাকার গুণ। এই গুণ অহংভাবের জন্য সম্ভব এবং এই অহঙ্কার অব্যক্ত প্রকৃতিতে রহিয়াছে। মোহশূন্য মানুষ এই অহঙ্কারকে জ্ঞানপূর্ব্বক ত্যাগ করে। আর এ কারণ মৃত্যুর সময় অথবা অন্যান্য আঘাতের জন্যও সে দুঃখ পায় না। জ্ঞানী অজ্ঞানী সকলের তো শেষকালে এই বিকারশীল ক্ষেত্রকে ত্যাগ করিয়াই নিস্তার।

অমানিত্ব, অদাম্ভিকতা, অহিংসা, ক্ষমা, সরলতা, আচার্য্যের সেবা, শুদ্ধতা, স্থিরতা,

আত্মসংযম, ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে বৈরাগ্য, অহঙ্কারশূন্যতা, জন্ম মরণ জরা ব্যাধি দুঃখ ও দোষের নিরন্তর সমালোচনা, পুত্র স্ত্রী এবং গৃহাদিতে মোহ এবং মমতার অভাব, প্রিয় ও অপ্রিয় বিষয়ে সমভাব, আমার প্রতি অনন্যধ্যানপূর্ব্বক একনিষ্ঠ ভক্তি, নির্জন স্থানে অবস্থান, জন সমূহে সম্মিলিত হওয়ার অনিচ্ছা, আধ্যাত্মিক জ্ঞানের নিত্যতার বোধ এবং আত্মদর্শন—এই সকলকে জ্ঞান কহে। ইহার বিপরীত যাহা তাহা অজ্ঞান। ৭-৮-৯-১০-১১

যাহা জানিলে লোকে মোক্ষ পায়, ঐ জ্ঞেয় কি তাহা তোমাকে কহিব। উহা অনাদি পরম ব্রহ্ম; তাহাকে সৎও বলা চলে না, অসৎও বলা চলে না। ১২

টিপ্পনী—পরমেশ্বরকে সৎ অথবা অসৎ কহা যায় না। কোনো এক শব্দে তাঁহার ব্যখ্যা অথবা পরিচয় হইতে পারে না, তিনি এইরূপ গুণাতীত স্বরূপ।

সর্ব্বত্র তাঁহার হাত, পা, চোখ, মাথা, মুখ আর কান আছে। সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া তিনি জগতে বিদ্যমান আছেন। ১৩

সব ইন্দ্রিয়ের গুণের আভাস তাঁহাতে পাওয়া যায়, তথাপি ঐ স্বরূপ ইন্দ্রিয়রহিত; তিনি সকল হইতে অলিপ্ত, তথাপি সকলকে ধারণ করেন; তিনি গুণরহিত, তথাপি সকল গুণের ভোক্তা। ১৪

তিনি ভূত সকলের বাহিরে এবং অন্তরেও আছেন। তিনি গতিমান, স্থির ও সূক্ষ্ম বলিয়া তাঁহাকে জানা যায় না, তিনি দূরে ও নিকটে আছেন। ১৫

টিপ্পনী—যে তাঁহাকে চিনে, সে তাঁহার ভিতরে আছে। গতি ও স্থিরতা, শান্তি ও অশান্তি যাহা আমরা অনুভব করি এবং সকল ভাব তাঁহা হইতেই উৎপন্ন হয়, এ জন্য তিনি গতিমান ও স্থির।

ভূতদিগের মধ্যে তিনি অবিভক্ত আছেন এবং বিভক্তের ন্যায়ও বিদ্যমান আছেন। তিনি জানার যোগ্য (ব্রহ্ম) প্রাণীদের পালনকর্ত্তা, সংহারকর্ত্তা ও সৃষ্টিকর্ত্তা। ১৬

তিনি জ্যোতিষ্কমণ্ডলীরও জ্যোতি, তাঁহাকে অন্ধকারের অতীত কহা যায়। জ্ঞান তিনি, জানার যোগ্য তিনি এবং জ্ঞান দ্বারা যাহা পাওয়া যায় তাহাই তিনি। তিনি সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছেন। ১৭

এই প্রকারে ক্ষেত্র, জ্ঞান এবং জ্ঞেয়ের

বিষয়ে সংক্ষেপে আমি বলিলাম। ইহা জানিয়া, আমার ভক্ত আমার ভাব পাওয়ার যোগ্য হয়। ১৮

প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কে অনাদি বলিয়া জানিও। বিকার ও গুণ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন জানিবে। ১৯

প্রকৃতিকে কার্য্য-কারণের হেতু আর পুরুষকে সুখ দুঃখ ভোগের হেতু কহা যায়। ২০

প্রকৃতিতে অবস্থিত হইয়া পুরুষ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন গুণ ভোগ করে, আর এই গুণ সঙ্গই তাহার ভাল মন্দ যোনিতে জন্মের কারণ। ২১

টিপ্পনী—লৌকিক ভাষায় আমরা প্রকৃতিকে মায়া বলি। পুরুষ জীব। মায়া অর্থাৎ মূল স্বভাবের

বশীভূত জীব সাত্ত্বিক রাজসিক অথবা তামসিক কার্য্যের ফল ভোগ করে এবং সেই কর্ম্ম অনুসারে পুনর্জন্ম লাভ করে।

এই দেহে স্থিত পরম পুরুষকে সর্ব্ব সাক্ষী, অনুমতিদাতা, ভর্ত্তা, ভোক্তা, মহেশ্বর এবং পরমাত্মাও কহা হয়। ২২

যে মানুষ এই প্রকার পুরুষ ও গুণময়ী প্রকৃতিকে জানে সে সর্ব্ব প্রকারে কাজ করিয়াও পুনর্জন্ম লাভ করে না। ২৩

টিপ্পনী—২, ৯, ১২ এবং অন্যান্য অধ্যায়ের সাহায্যে আমরা জানিতে পারি যে, এই শ্লোক স্বেচ্ছাচার সমর্থন করে না, বরং ইহা ভক্তির মহিমা-সূচক। কর্ম্মমাত্রই জীবের পক্ষে বন্ধনকারক; কিন্তু যদি সে সকল কর্ম্ম পরমাত্মাকে অর্পণ করে তবে সে বন্ধনমুক্ত হয়। আর এই প্রকারে যাহার

ভিতর হইতে কর্ত্তৃত্বরূপ অহং ভাব নষ্ট হইয়া গিয়াছে, আর যে ব্যক্তি অন্তর্যামীকে চব্বিশ ঘণ্টাই দেখিতে থাকে সে পাপ কর্ম্ম করিতেই পারে না। পাপের মূল অভিমান। যেখানে 'আমি' নাই সেখানে পাপ নাই। এই শ্লোক পাপ কর্ম্ম না করার যুক্তি দেখাইতেছে।

কেহ কেহ ধ্যানমার্গে থাকিয়া আত্মাদ্বারা নিজের ভিতর আত্মাকে দেখে। কেহ জ্ঞানমার্গে আর অপর কেহ কেহ কর্ম্মমার্গের পথে তাহাকে দর্শন করে। ২৪

আবার কেহ কেহ এই সব মার্গ না জানার জন্য অন্যের নিকট পরমাত্মার বিষয় শুনিয়া শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া তৎপরায়ণ হইয়া তাহার উপাসনা করে। তাহারাও মৃত্যুকে অতিক্রম করে। ২৫

হে ভরতর্ষভ! স্থাবর, জঙ্গম যে কিছু পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে উৎপন্ন বলিয়া জানিও। ২৬

সমস্ত ধ্বংসশীল প্রাণীর মধ্যে অবিনাশী পরমেশ্বর সমভাবে থাকেন, ইহা যে জানে সেই তাঁহাকে জানে। ২৭

যে ঈশ্বরকে সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থিত দেখে, সে নিজেকে নিজে আঘাত করে না, আর এজন্য সে পরম গতি প্রাপ্ত হয়। ২৮

টিপ্পনী—সমভাবে অবস্থিত ঈশ্বরকে যে দেখে, সে স্বয়ং তাহাতে বিলীন হইয়া যায় এবং অপর কিছুই দেখে না। এ হেতু বিকারবশ না হইয়া সে মোক্ষ পায়, আপনার শত্রু আপনি হয় না।

সর্ব্বত্র প্রকৃতিই কর্ম্ম করিয়া থাকে, এরূপ যে বুঝে এবং এজন্য আত্মাকে অকর্ত্তারূপে জানে সেই জানে। ২৯

টিপ্পনী—যেরূপ ঘুমন্ত মানুষের আত্মা নিদ্রার কর্ত্তা নহে, কিন্তু প্রকৃতি নিদ্রার কাজ করিয়া থাকে। নির্বিকার পুরুষের আঁখি যেমন কোনো কু দৃশ্য দেখে না। প্রকৃতি ব্যভিচারিণী নহে। অভিমানী পুরুষ যখন তাহার প্রভু হয়, তখন তাহার সংশ্রবে তাহার বিষয়বিকার উৎপন্ন হয়।

জীবগণের অস্তিত্ব পৃথক হইলেও, যখন সে তাহাদিগকে একেতেই অবস্থিত দেখে এবং এজন্য প্রকৃতি হইতে তাহাদের সকলের উৎপত্তি হইয়াছে বুঝে, তখন সে ব্রহ্মকে পায়। ৩০

টিপ্পনী—অনুভব দ্বারা সব কিছু ব্রহ্মেতে দেখাই ব্রহ্মকে পাওয়া, এই সময় জীব শিব হইতে ভিন্ন থাকে না।

হে কৌন্তেয়! এই অবিনাশী পরমাত্মা অনাদি এবং নির্গুণ বলিয়া শরীরে থাকিয়াও কিছু করে না এবং কিছুতে লিপ্ত হয় না। ৩১

সূক্ষ্ম হওয়ার দরুণ যে প্রকার সর্ব্বব্যাপী আকাশ কোনো পদার্থের সহিত লিপ্ত হয় না, সেইরূপ সমস্ত দেহে বিদ্যমান আত্মা কিছুতে লিপ্ত হয় না। ৩২

হে ভারত! যেমন একই সূর্য্য সমগ্র জগৎকে প্রকাশিত করে, ঐ রূপ ক্ষেত্রী যাবতীয় ক্ষেত্রকে প্রকাশিত করে। ৩৩

যাহারা জ্ঞান চক্ষু দ্বারা ক্ষেত্র ও

ক্ষেত্রজ্ঞের ভেদ এবং প্রকৃতির বন্ধন হইতে
প্রাণীদের মুক্তি কিরূপে হয় তাহা জানে,
তাহারা ব্রহ্মকে পায়। ৩৪

ওঁ তৎ সৎ

এই প্রকারে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপ উপনিষদ অর্থাৎ ব্রহ্ম-বিদ্যান্তর্গত যোগশাস্ত্রের শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগযোগ নামক ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

গুণত্রয়বিভাগযোগ

গুণময়ী প্রকৃতির অল্প পরিচয় দেওয়ার পর, সহজেই এই অধ্যায়ে তিন গুণের বর্ণনা করা আবশ্যক। আর ইহা করিতে করিতে ভগবান গুণাতীতের লক্ষণ বলিতেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে যে লক্ষণ স্থিতপ্রজ্ঞে দেখা গিয়াছে, দ্বাদশ অধ্যায়ে যাহা ভক্তের ভিতর দেখা গিয়াছে, এই অধ্যায়ে তাহা গুণাতীতে আছে।

শ্রীভগবান কহিলেন—

সমস্ত জ্ঞানের মধ্যে যে উত্তম জ্ঞান অনুভব করিয়া সকল মুনি এই শরীর ত্যাগ করার পর পরম গতি পাইয়াছে, তাহা আমি তোমাকে পুনরায় কহিব। ১

এই জ্ঞানের আশ্রয় লইয়া যাহারা আমার ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, সৃষ্টিকালে তাহাদের জন্মিতে হয় না এবং প্রলয় কালেও ব্যথিত হইতে হয় না। ২

হে ভারত! মহৎ ব্রহ্ম অর্থাৎ প্রকৃতিই আমার যোনি। তাহাতে আমি গর্ভাধান করি এবং তাহা হইতে প্রাণীমাত্রের উৎপত্তি হয়। ৩

হে কৌন্তেয়! সমস্ত যোনিতে যে যে প্রাণীর উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহাদের উৎপত্তির স্থান আমার প্রকৃতি এবং তাহাতে বীজরোপণকারী পিতা বা পুরুষ আমি। ৪

হে মহাবাহো! সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হয়

এই গুণত্রয় অবিনাশী দেহধারীকে বা জীবকে দেহের সহিত আবদ্ধ করে। ৫

হে অনঘ! ইহার মধ্যে সত্ত্বগুণ নির্ম্মল হওয়ার জন্য প্রকাশক ও আরোগ্যকর। ইহা দেহীকে সুখ ও জ্ঞানের সম্বন্ধে বাঁধে অর্থাৎ সুখ ও জ্ঞান সম্পন্ন করে। ৬

হে কৌন্তেয়! রজোগুণ রাগরূপ বলিয়া তৃষ্ণা ও আসক্তির মূল। ইহা দেহধারীকে কর্ম্ম পাশে আবদ্ধ করে। ৭

হে ভারত! তমোগুণ অজ্ঞানমূলক। ইহা দেহধারী মাত্রকে মোহে ফেলে এবং অসাবধানতা, আলস্য এবং নিদ্রার দ্বারা দেহীকে বন্ধন করে। ৮

হে ভারত! সত্ত্বগুণ আত্মার শান্তি সুখের কারণ; রজোগুণ আত্মাকে কর্ম্ম

করিতে প্রবুদ্ধ করে এবং তমোগুণ জ্ঞানকে ঢাকিয়া আত্মাকে প্রমাদের বশীভূত করে। ৯

হে ভারত! রজো ও তমোগুণকে দাবাইয়া সত্ত্বগুণ প্রবল হয়; সত্ত্ব ও তমো গুণকে দাবাইয়া রজোগুণ এবং সত্ত্ব ও রজোগুণকে দাবাইয়া তমোগুণ প্রবল হয়। এইরূপে সত্ত্বাদিগুণ নিজ নিজ কাজ করে। ১০

যখন সকল ইন্দ্রিয়দ্বারে জ্ঞানরূপ প্রকাশের উদ্ভব (জ্ঞানালোক প্রকাশিত) হয়, তখন সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে জানিবে।১১

হে ভরতর্ষভ! রজোগুণ বৃদ্ধি হইলে লোভ, প্রবৃত্তি, কর্ম্মারম্ভ, অশান্তি এবং ইচ্ছার উদয় হয়। ১২

হে কুরুনন্দন! তমোগুণ বৃদ্ধি হইলে অজ্ঞান, জড়তা, অসাবধানতা ও মোহ উৎপন্ন হয়। ১৩

সত্ত্বগুণ বৃদ্ধির সময় যদি কেহ মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে সে উত্তম জ্ঞানীদের নির্ম্মল লোক প্রাপ্ত হয়। ১৪

রজোগুণ বৃদ্ধিকালে কাহারও মৃত্যু হইলে দেহধারী কর্ম্মাসক্ত লোকে জন্মগ্রহণ করে; আর তমোগুণ বর্দ্ধিত হওয়ার সময় কেহ মরিলে সে মূঢ় যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। ১৫

টিপ্পনী—কর্ম্মাসক্ত লোকের অর্থ মনুষ্যলোক আর মূঢ়যোনির অর্থ পশু ইত্যাদি জন্ম।

সৎ কর্ম্মের ফল সাত্ত্বিক ও নির্ম্মল

হইয়া থাকে। রাজসিক কর্ম্মের ফল দুঃখ, এবং তামসিক কর্ম্মের ফল অজ্ঞান। ১৬

টিপ্পনী—যাহাকে আমরা সুখদুঃখ বলি, সে সুখদুঃখের উল্লেখ এখানে নাই বুঝিতে হইবে। সুখের অর্থ আত্মানন্দ, আত্মপ্রকাশ। ইহার উল্টা দুঃখ। ১৭ শ্লোকে ইহা স্পষ্ট হইয়াছে।

সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, রজোগুণ হইতে লোভ ও তমোগুণ হইতে অসাবধানতা, মোহ ও অজ্ঞান উৎপন্ন হয়। ১৭

সাত্ত্বিক মানুষ ঊর্দ্ধে উঠে, রাজসী মানুষ মধ্যে অবস্থান করে এবং নিকৃষ্ট গুণযুক্ত তামসিক লোক অধোগতি প্রাপ্ত হয়। ১৮

গুণ ভিন্ন আর কেহ কর্ত্তা নাই, জ্ঞানী যখন এরূপ দেখে এবং গুণাতীতকে জানে, তখন সে আমার ভাব প্রাপ্ত হয়। ১৯

টিপ্পনী—গুণ সকলকে যে কর্ত্তা বলিয়া মানে তাহার অহংভাব হয়ই না। এজন্য তাহার কাজ সকল স্বাভাবিক এবং শুধু শরীরযাত্রার জন্যই অনুষ্ঠিত হয়। শরীররক্ষা পরমার্থের জন্য হওয়াতে তাহার কার্য্যমাত্রে নিরন্তর ত্যাগ এবং বৈরাগ্য থাকা চাই। এরূপ জ্ঞানী সহজেই গুণাতীত নির্গুণ ঈশ্বরকে চিন্তা ও ভজনা করে।

দেহসম্ভূত এই তিন গুণ অতিক্রম করিয়া দেহধারী জন্ম, মৃত্যু ও জরাজনিত দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে। ২০

অর্জ্জুন কহিলেন—

হে প্রভো! এই তিন গুণকে যে অতিক্রম করিয়াছে, কি লক্ষণ দ্বারা তাহাকে চেনা যাইবে? তাহার আচার কিরূপ, আর কিরূপে সে তিন গুণ অতিক্রম করে? ২১

শ্রীভগবান কহিলেন—

হে পাণ্ডব! প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহপ্রাপ্ত হইলে যে দুঃখিত হয় না এবং তাহাদের না পাইলেও পাইতে ইচ্ছা করে না, উদাসীনের মত যে স্থির থাকে এবং বিচলিত হয় না, যে সুখদুঃখে সমভাবে থাকে, যে স্বস্থ অর্থাৎ আপনাতে স্থির থাকে, যে মাটির ঢেলা পাথর ও সোনা সমান দেখে, প্রিয় অথবা অপ্রিয় বস্তু প্রাপ্ত হইলে একই ভাবে থাকে, নিজের নিন্দা অথবা স্তুতি যার নিকট সমান, যে এরূপ বুদ্ধিমান যে মান অপমান তার নিকট সমান, যে মিত্রপক্ষ ও শত্রুপক্ষে সমান ভাব রাখে এবং যে সমস্ত আরম্ভ ত্যাগ করিয়াছে, তাহাকে গুণাতীত কহা যায়। ২২-২৩-২৪-২৫

টিপ্পনী—২২ হইতে ২৫ শ্লোক এক সাথে আলোচনা করা দরকার। প্রকাশ প্রবৃত্তি এবং মোহ পূর্ব্বের শ্লোক অনুসারে ক্রমশঃ সত্ত্ব, রজঃ ও তমের পরিণাম অথবা চিহ্ন। অর্থাৎ এখানে ইহা বলার তাৎপর্য্য এই, যে গুণাতীত হইয়াছে, তাহার উপর ঐ পরিণামের কোনো প্রভাব নাই। পাথরের ভিতর প্রকাশের ইচ্ছা নাই; প্রবৃত্তি বা জড়তা কিছুরই জন্য তার ক্ষোভ হয় না; ইচ্ছাহীন হইলেও তার ভিতর শান্তি আছে। তাহাকে কেহ গতি দিলেও সে তাহার দ্বেষ করে না। আবার গতি দেওয়ার পর উহাকে স্থির করিয়া রাখিলেও গতি বন্ধ হওয়ার নিমিত্ত জড়তা-প্রাপ্ত হইল মনে করিয়া আর সে দুঃখিত হয় না; বরং তিন অবস্থাতেই সে একরূপই থাকে। পাথর আর গুণাতীতের মধ্যে এই অন্তর যে গুণাতীত চেতনা-ময় আর সে জ্ঞানপূর্ব্বক গুণের পরিণতি সকলের,

স্পর্শ সকলের ত্যাগ করিয়া জড় পাথরের ন্যায় হইয়াছে। পাথর গুণের অর্থাৎ প্রকৃতির কার্য্যের সাক্ষী কিন্তু কর্ত্তা নহে। এইরূপে জ্ঞানী প্রকৃতির কাজের সাক্ষী—কর্ত্তা নহে। এরূপ জ্ঞানী সম্বন্ধে ইহা মনে করা যায় যে, সে ২৩ শ্লোকের 'গুণ আপনার কাজ করিয়া যাইতেছে' এই কথা জানিয়া বিচলিত হয় না, উদাসীনের মত থাকে অর্থাৎ অটল থাকে। গুণে তন্ময় থাকিয়া আমরা এইরূপ অবস্থা কেবল ধৈর্য্যের সহিত কল্পনার সাহায্যে বুঝিতে পারি, ইহা অনুভব করিতে পারি না। পরন্তু ঐ কল্পনাকে দৃষ্টির ভিতর রাখিয়া যদি আমরা আমিত্বকে দিন দিন ক্ষীণ করিতে থাকি, তবে অন্তে গুণাতীতের অবস্থার নিকট পৌঁছিয়া ঐ অবস্থা সম্বন্ধে কিছু প্রত্যক্ষজ্ঞান লাভ করিতে পারি। যিনি গুণাতীত তিনি আপনার অবস্থা অনুভব করিতে পারেন, কিন্তু বর্ণনা করিতে সক্ষম নহেন।

যে ব্যক্তি নিজের অবস্থা বর্ণনা করিতে সক্ষম সে গুণাতীত নহে, কারণ তাহার ভিতর অহংভাব বর্ত্তমান আছে : যাহা সকল লোক সহজে অনুভব করিতে পারে, তাহা শান্তি বা প্রকাশ (সত্ত্ব) প্রবৃত্তি বা কর্ম্ম (রজঃ) এবং জড়তা বা মোহ (তমোগুণ)। সাত্ত্বিকতা এই গুণাতীতের অতি সান্নিধ্যের অবস্থা। ইহা গীতায় স্থানে স্থানে স্পষ্ট করা হইয়াছে। এ জন্য মানুষ মাত্রের সত্ত্বগুণের বিকাশ করার জন্য প্রযত্ন হওয়া চাই। সে গুণাতীত অবস্থা নিশ্চয়ই পাইবে এ বিশ্বাস তাহার রাখা কর্ত্তব্য।

যে একনিষ্ঠ ভক্তিযোগ দ্বারা আমার সেবা করে, সে এই গুণ সকল অতিক্রম করিয়া ব্রহ্ম রূপ হওয়ার যোগ্য হয়। ২৬

আর ব্রহ্মের যে স্থিতি তাহা আমি, শাশ্বত মোক্ষের যে স্থিতি তাহাও আমি।

ঐরূপ সনাতন ধর্ম্ম ও উত্তম সুখের যে স্থিতি তাহাও আমি। ২৭

ওঁ তৎ সৎ

এই প্রকারে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপ উপনিষদ অর্থাৎ ব্রহ্ম-বিদ্যান্তর্গত শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে গুণত্রয়বিভাগযোগ নামক চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

পঞ্চদশ অধ্যায়

পুরুষোত্তমযোগ

এই অধ্যায়ে ক্ষর ও অক্ষরের অতীত নিজের উত্তম স্বরূপ ভগবান বুঝাইয়াছেন।

শ্রীভগবান কহিলেন—

যার মূল উঁচুতে, যার শাখা নীচে এবং বেদ যার পাতা, এরূপ অবিনাশী অশ্বত্থ বৃক্ষকে বুদ্ধিমান লোক বর্ণনা করিয়াছেন; ইহাকে যে জানে সে বেদজ্ঞ জ্ঞানী। ১

টিপ্পনী—'শ্ব' এর অর্থ আগামী কাল। এজন্য অশ্বত্থের অর্থ আগামী কাল তক যাহা টিকিবে না এরূপ ক্ষণিক সংসার। প্রতিক্ষণ সংসারের রূপান্তর হইতেছে সেজন্য উহা অশ্বত্থ। পরন্তু এরূপ স্থিতিতে তাহা সর্ব্বদা আছে এবং তাহার মূল

ঊর্দ্ধে অর্থাৎ ঈশ্বরে এজন্য তাহা অবিনাশী। উহাতে যদি বেদ অর্থাৎ ধর্ম্মের শুদ্ধ জ্ঞানরূপ পাতা না থাকে তবে উহা শোভা দেয় না। এই প্রকার সংসারের যথার্থ জ্ঞান যাহার আছে আর যে ধর্ম্মকে জানে সে জ্ঞানী।

গুণের স্পর্শ দ্বারা বর্দ্ধিত এবং বিষয়রূপ তরুণ পল্লবযুক্ত ঐ অশ্বত্থের ডাল নীচে এবং উপরে বিস্তৃত; কর্ম্মের বন্ধনকারী তার মূল নীচে মনুষ্যলোকে বিস্তৃত আছে। ২

টিপ্পনী—এই সংসারবৃক্ষকে অজ্ঞানী যে ভাবে দেখে, তাহাই এখানে বর্ণিত হইল। ঈশ্বরে অবস্থিত মূল সে দেখে না, কারণ বিষয়ের রমণীয়তায় মুগ্ধ হইয়া সে তিন গুণ দ্বারা এই বৃক্ষকে পোষণ করে এবং মনুষ্যলোকে কর্ম্মপাশে বাঁধা রহে।

ইহার যথার্থ স্বরূপ দেখা যায় না। ইহার অন্ত নাই, আদি নাই, ভিত্তি নাই।

খুব গভীরপ্রবিষ্ট মূলযুক্ত এই অশ্বত্থ বৃক্ষকে অসঙ্গ রূপ কঠিন শস্ত্র দ্বারা কাটিয়া মানুষের এই প্রার্থনা করা চাই "যিনি সনাতন প্রবৃত্তি বা মায়াকে বিস্তার করিয়াছেন, আমি সেই আদি পুরুষের শরণ লইতেছি।" এবং যাহাকে পাইলে পুনরায় কাহাকেও জন্ম মরণের চক্রে পড়িতে হয় না সেই পদ অন্বেষণ করিতে হইবে। ৩-৪

টিপ্পনী—অসঙ্গের অর্থ অসহযোগ, বৈরাগ্য। যখন পর্য্যন্ত মানুষ বিষয় হইতে অসহযোগ না করে, তাহার প্রলোভন হইতে দূরে না রহে, ততক্ষণ সে উহাতে আকৃষ্ট হইবে। বিষয়ের সহিত খেলা করিয়া আনন্দ উপভোগ করা, আর উহা হইতে মুক্ত থাকা যে অসম্ভব, ইহাই এই শ্লোকের তাৎপর্য্য।

যে ব্যক্তি মান ও মোহ ত্যাগ করিয়াছে,

যে আসক্তি হইতে উৎপন্ন দোষ দূর করিয়াছে, যে আত্মাতে নিত্য নিমগ্ন আছে, যাহার বিষয়তৃষ্ণা শান্ত হইয়া গিয়াছে, যে সুখ-দুঃখ রূপ দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত, সেই জ্ঞানী অবিনাশী পদ পায়। ৫

সেখানে সূর্য্য চন্দ্র অথবা অগ্নির আলো দানের আবশ্যক হয় না। যেখানে গেলে পুনরায় জন্মিতে হয় না, উহাই আমার পরম ধাম। ৬

আমার সনাতন অংশ জীবলোকে জীব হইয়া প্রকৃতিতে বিদ্যমান পাঁচ ইন্দ্রিয় ও মনকে আকর্ষণ করে। ৭

(জীবভূত আমার এই অংশরূপী) ঈশ্বর যখন শরীর ধারণ করে অথবা ত্যাগ করে, তখন বায়ু যেমন আশপাশের মণ্ডল হইতে

গন্ধ লইয়া যায় সেইরূপ সে ইহাদিগকে (মনের সহিত ইন্দ্রিয়দিগকে) সঙ্গে লইয়া যায়। ৮

আর সে (এই জীব) কান, চোখ, চামড়া, জিহ্বা, নাক এবং মনের আশ্রয় লইয়া বিষয়-সমূহ ভোগ করে। ৯

টিপ্পনী—এখানে বিষয় শব্দের অর্থ বীভৎস বিলাস নয়, পরন্তু ঐ সব ইন্দ্রিয়ের স্বাভাবিক ক্রিয়া; যেমন চোখের বিষয় দেখা, কানের বিষয় শোনা এবং জিহ্বার বিষয় চাখা। যখন এই সব কাজ বিকারযুক্ত বা অহংভাবযুক্ত থাকে, তখন তাহারা দূষিত বা বীভৎস বিবেচিত হয়; যখন নির্বিকার হয় তখন তাহারা নির্দোষ। বালক চোখ দিয়া দেখে ও হাত দিয়া স্পর্শ করে কিন্তু সে বিকারগ্রস্ত হয় না তাহা নীচের শ্লোকে বলা হইয়াছে।

(শরীর) ত্যাগ কারী অথবা তাহাতে

অবস্থানকারী কিংবা গুণসমূহের আশ্রয় লইয়া বিষয়ভোগকারী এই অংশরূপী ঈশ্বরকে মূর্খেরা দেখে না, পরন্তু দিব্যচক্ষু জ্ঞানীরা দেখে। ১০

যত্নশীল যোগীগণ নিজেদের দেহস্থ এই ঈশ্বরকে দেখে। যাহারা আত্মশুদ্ধি করে নাই এরূপ মূঢ়েরা যত্ন করা সত্ত্বে ইহাকে দেখিতে পায় না। ১১

টিপ্পনী—ইহাতে এবং নবম অধ্যায়ে দুরাচারীকে ভগবান যে কথা দিয়াছেন, তাহাতে বিরোধ নাই। অকৃতাত্মা অর্থাৎ ভক্তিহীন, স্বেচ্ছাচারী, দুরাচারী। যে নম্রভাবে শ্রদ্ধার সহিত ঈশ্বরের সেবা করে সে আত্মশুদ্ধ হয় ও ঈশ্বরকে দেখে। যাহারা যম-নিয়মাদির পরোয়া না করিয়া কেবল বুদ্ধিপ্রয়োগ দ্বারা ভগবানকে দেখিতে

চায়, সেই সব বেহুঁস্, চিত্তহীন, ভগবদ্বিমুখ লোকে ভগবানকে দেখিতে পায় না।

সূর্য্যে বিদ্যমান যে তেজ সমগ্র জগৎকে প্রকাশিত করিতেছে এবং যে তেজ চন্দ্র তথা অগ্নিতে বিদ্যমান আছে তাহাকে আমার তেজ বলিয়াই জানিবে। ১২

পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়া আমার শক্তিতে আমি প্রাণীগণকে ধারণ করি এবং রস-উৎপন্নকারী চন্দ্র হইয়া সমস্ত বনস্পতির পোষণ করি। ১৩

প্রাণীদের দেহে আশ্রয় লইয়া জঠরাগ্নি হইয়া প্রাণ ও অপান বায়ু দ্বারা আমি চার প্রকারের অন্ন পরিপাক করি। ১৪

সকলের হৃদয়ে বিদ্যমান আমাদ্বারা স্মৃতি ও জ্ঞান জন্মে এবং তাহাদের অভাবও

ঘটে। আমিই সব বেদদ্বারা জানার যোগ্য, আমিই বেদ জানি, বেদান্তের প্রকটকর্ত্তাও আমি। ১৫

এই লোকে ক্ষর অর্থাৎ নাশবান এবং অক্ষর অর্থাৎ অবিনাশী এই দুই পুরুষ আছে। তাহার মধ্যে ভূতমাত্র ক্ষর এবং তাহাতে অবস্থিত যে অন্তর্যামী আছেন তাহা অক্ষর। ১৬

ইহা ভিন্ন অপর একটি উত্তম পুরুষ আছেন, তাহাকে পরমাত্মা কহে। এই অব্যয় ঈশ্বর ত্রিলোকমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদের পোষণ করিতেছেন। ১৭

যেহেতু আমি ক্ষরের অতীত এবং অক্ষর হইতেও উত্তম, সেজন্য বেদ ও লোকমধ্যে আমি পুরুষোত্তম নামে প্রখ্যাত। ১৮

হে ভারত! মোহরহিত হইয়া আমাকে এরূপ পুরুষোত্তম বলিয়া যে জানে, সে সব জানে এবং আমাকে পূর্ণভাবে ভজনা করে। ১৯

হে নিষ্পাপ! এই গুহ্য হইতে গুহ্য শাস্ত্র আমি তোমাকে বলিলাম। হে ভারত! ইহা জানিয়া মানুষ বুদ্ধিমান হয় এবং নিজের জীবন সফল করে। ২০

ওঁ তৎ সৎ

এই প্রকারে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপ উপনিষদ অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যান্তর্গত যোগশাস্ত্রের শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে পুরুষোত্তম যোগ নামক পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

ষোড়শ অধ্যায়

দৈবাসুরসম্পদবিভাগযোগ

এই অধ্যায়ে দৈবী ও আসুরী সম্পদের বর্ণনা আছে।

শ্রীভগবান কহিলেন—

হে ভারত! যে দৈবী সম্পদ লইয়া জন্ম গ্রহণ করে তাহার ভিতর অভয়, অন্তঃকরণ শুদ্ধি, জ্ঞান ও যোগনিষ্ঠা, দান, দম, যজ্ঞ, স্বাধ্যায়, তপ, সরলতা, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, অপৈশুন, ভূতদয়া, অলোলুপতা, মৃদুতা, মর্য্যাদা, অচঞ্চলতা, তেজ, ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ, অদ্রোহ, ও নিরভিমান থাকে। ১-২-৩

টিপ্পনী—দম অর্থাৎ ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, অপৈশুন

অর্থাৎ কাহারও নিন্দা না করা, অলোলুপতা অর্থাৎ লালসাযুক্ত না হওয়া—লম্পট না হওয়া ; তেজ অর্থাৎ প্রত্যেক প্রকার হীন বৃত্তির বিরোধিতা করার প্রবল ইচ্ছা ; অদ্রোহ অর্থাৎ কাহারও মন্দ ইচ্ছা না করা অথবা মন্দ না করা।

হে পার্থ ! আসুরী সম্পদ লইয়া জন্ম-গ্রহণকারীর ভিতর দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, পারুষ্য ও অজ্ঞান বিদ্যমান আছে। ৪

টিপ্পনী—যাহা নিজের মধ্যে নাই তাহা দেখান দম্ভ, ছলনা, ভণ্ডামী ; দর্প অর্থাৎ বড়াই ; পারুষ্য অর্থাৎ কঠোরতা।

দৈবী সম্পদকে মোক্ষদায়ক এবং আসুরী সম্পদকে বন্ধনের হেতু বলা হয়। হে পাণ্ডব ! তুমি বিষাদ করিও না। তুমি দৈবী সম্পদ লইয়া জন্মিয়াছ। ৫

ইহলোকে দুই প্রকারের প্রাণী সৃষ্টি হইয়াছে—দৈবী এবং আসুরী। হে পার্থ! দৈবীর কথা বিস্তারপূর্ব্বক বর্ণনা করিয়াছি, এখন আসুরীর কথা শুন। ৬

আসুর লোকে প্রবৃত্তি কি নিবৃত্তি কি জানে না। ঐ প্রকারে তাহাদের শৌচ, আচার ও সত্যের জ্ঞান নাই। ৭

তাহারা বলে জগৎ অসত্য, নিরাধার ও ঈশ্বররহিত; কেবল স্ত্রীপুরুষের সংযোগে ইহা উৎপন্ন হইয়াছে। বিষয়ভোগ ছাড়া উহার আর কি হেতু হইতে পারে? ৮

ভয়ানক ক্রূরকর্ম্মী মন্দমতি দুষ্টগণ ঐ মত অবলম্বন করিয়া জগতের শত্রুরূপী হইয়া জগতের বিনাশের জন্যই জন্মগ্রহণ করে। ৯

অতৃপ্ত কামনায় পূর্ণ, দম্ভী, মানী, মদান্ধ

আসুর লোক মিথ্যা সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া অন্যায় কাজে প্রবৃত্ত হয়। ১০

আমরণ অপরিমেয় বিষয়বাসনাযুক্ত ভোগসর্ব্বস্ব ব্যক্তি কাম ক্রোধের বশ হইয়া শতশত আশাপাশে বদ্ধ হইয়া বিষয়ভোগের জন্য অন্যায়পূর্ব্বক অর্থ সঞ্চয় করিতে ইচ্ছা করে। ১১-১২

আজ আমি ইহা পাইলাম। এই মনোরথ(এখন) পূর্ণ করিব; এত ধন আমার কাছে আছে, কাল ফের আর এত অর্থ আমার হইবে, এই শত্রুকে বিনাশ করিয়াছি, অন্য শত্রুকেও বিনাশ করিব; আমি সর্ব্বসম্পন্ন, আমি ভোগী, আমি সিদ্ধ, আমি বলবান, আমি সুখী; আমি শ্রীমান্, আমি কুলীন, আমার সমান আর কে

আছে ? আমি যজ্ঞ করিব, দান করিব, আনন্দ করিব ; অজ্ঞানমূঢ় লোকে এরূপ মনে করে এবং অনেক ভ্রান্তি ও মোহজালে পড়িয়া বিষয়ভোগে মত্ত হইয়া অশুভ নরকে পড়ে। ১৩-১৪-১৫-১৬

আত্মপ্রশংসাকারী, অবিনয়ী লোকে ধন ও মানমদে মত্ত হইয়া দম্ভবশে বিধিরহিত নামমাত্র যজ্ঞ করে। ১৭

অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধের আশ্রয় লইয়া নিন্দাকারী তাহাদের ও অন্যের দেহে অবস্থিত আমার দ্বেষ করে। ১৮

এই সব নীচ, দ্বেষী, ক্রুর, অশুভকারী নরাধমকে আমি এই সংসারে অত্যন্ত আসুরী যোনিতে বার বার নিক্ষেপ করি। ১৯

হে কৌন্তেয়! জন্ম জন্ম আসুরী জন্ম গ্রহণ করিয়া এবং আমাকে না পাইয়া এই সব মূঢ় লোক ইহা অপেক্ষা অধম গতি প্রাপ্ত হয়। ২০

আত্মাকে নাশ করার জন্য নরকের এই তিনটি দ্বার আছে—কাম, ক্রোধ ও লোভ। এই তিনটি মানুষের ত্যাগ করা চাই। ২১

হে কৌন্তেয়! এই ত্রিবিধ নরকদ্বার হইতে যে দূরে থাকে, সে আত্মার কল্যাণ করে, আর ইহা হইতে পরম গতি পায়। ২২

যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি ছাড়িয়া স্বেচ্ছায় ভোগে লীন হয়, সে না পায় সিদ্ধি, না পায় সুখ, না পায় পরম গতি। ২৩

টিপ্পনী—শাস্ত্রবিধির অর্থ ধর্ম্মের নামে যাহাকে মানা হয় সেই গ্রন্থে বর্ণিত অনেক ক্রিয়া নহে,

ইহা অনুভবজ্ঞানী সৎপুরুষের আচরিত সংযম মার্গ।

সুতরাং কার্য্য ও অকার্য্য নির্ণয় করার জন্য তোমাকে শাস্ত্রবিধি মানিতে হইবে। শাস্ত্রবিধি কি তাহা জানিয়া ইহলোকে তোমার কর্ম্ম করা উচিত। ২৪

টিপ্পনী - যাহা উপরে বলা হইয়াছে এখানেও শাস্ত্রের সেই অর্থ। নিজ নিজ নিয়ম বানাইয়া সকলের স্বেচ্ছাচারী হওয়া ঠিক নহে, পরন্তু যাহারা ধর্ম্মকে উপলব্ধি করিয়াছেন তাঁহাদের বাক্যকে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয় ইহাই এই শ্লোকের তাৎপর্য্য।

ওঁ তৎ সৎ

এই প্রকারে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপ উপনিষদ অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যান্তর্গত যোগশাস্ত্রের শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে দৈবাসুরসম্পদ বিভাগযোগ নামক ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

সপ্তদশ অধ্যায়

শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ

শাস্ত্র অর্থাৎ শিষ্টাচারকে প্রামাণ্য গণ্য করা চাই, ইহা শুনিয়া অর্জ্জুনের মনে সংশয় উপস্থিত হইল—যে ব্যক্তি শাস্ত্র মানিতে সক্ষম হয় না, পরন্তু শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আচরণ করে, তাহার কিরূপ গতি হইয়া থাকে? ইহার জবাব দেওয়ার প্রযত্ন এই অধ্যায়ে আছে। কিন্তু শিষ্টাচাররূপ দীপস্তম্ভ ত্যাগ করিয়া শ্রদ্ধার সহিত কর্ম্ম করিলে, তাহাতেও যে ভয়ের সম্ভাবনা আছে ভগবান তাহা বলিতেছেন। এ জন্য শ্রদ্ধা ও তাহা হইতে উদ্ভূত যজ্ঞ তপ দান আদিকে গুণানুসারে তিন ভাগ করিয়া দেখাইয়াছেন এবং ওঁ তৎ সতের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

অর্জ্জুন কহিলেন—

হে কৃষ্ণ! শাস্ত্রবিধি অর্থাৎ শিষ্টাচারের পরোয়া না করিয়া যে ব্যক্তি কেবল শ্রদ্ধার সহিত পূজাদি করে, তাহার গতি কিরূপ হয়? সাত্ত্বিক, রাজসী অথবা তামসী? ১

শ্রীভগবান কহিলেন—

মানুষের ভিতর স্বভাব হইতেই সাত্ত্বিক রাজসী ও তামসী এই তিন প্রকার শ্রদ্ধা হয়, তাহা তুমি শুন। ২

হে ভারত! সকলের শ্রদ্ধা নিজ নিজ স্বভাব অনুসরণ করে। মানুষের কিছু না কিছু শ্রদ্ধা তো আছেই। যাহার যেরূপ শ্রদ্ধা সে সেরূপ হয়। ৩

সাত্ত্বিক লোকে দেবতাদের ভজনা করে, রাজসিক লোকে যক্ষ ও রাক্ষসদিগকে

ভজনা করে, আর তামসিক লোকে ভূত প্রেতাদির ভজনা করে। ৪

দম্ভ ও অহঙ্কারযুক্ত কাম ও রাগ প্রেরিত হইয়া যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধিহীন ঘোর তপ করে, সেই মূঢ় শরীরস্থ পঞ্চমহাভূত এবং অন্তঃকরণে স্থিত আমাকেও কষ্ট দেয়। এরূপ লোককে আস্থরী ধারণাযুক্ত বলিয়া জানিও। ৫—৬

আহার তিন প্রকারে প্রাণীসকলের প্রিয় হয়। ঐরূপ যজ্ঞ তপ ও দান (তিন প্রকারে প্রিয়) হয়। উহাদের পার্থক্য তুমি শুন। ৭

আয়ু, সাত্বিকতা, বল, আরোগ্য, সুখ ও রুচিবর্দ্ধক, রস ও স্নেহযুক্ত, স্থির, এবং মনের রুচিকর আহার সাত্বিক লোকের প্রিয়। ৮

কটু, টক, ক্ষারযুক্ত, অত্যন্ত গরম, অতি লবণযুক্ত, অতি তীক্ষ্ণ, অতি রুক্ষ, অতি দাহকর আহার রাজসী লোকের প্রিয়, আর এইসব দ্রব্য দুঃখ শোক ও রোগ উৎপন্নকারী। ৯

প্রহরখানেক পূর্ব্বে প্রস্তুত, নীরস, দুর্গন্ধযুক্ত, বাসি, উচ্ছিষ্ট ও অপবিত্র খাদ্য তামসিক লোকের প্রিয়। ১০

ফলাসক্তিশূন্য ব্যক্তিগণ অবশ্যকর্ত্তব্য বোধে একাগ্রচিত্তে বিধিবিহিত যে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে সে যজ্ঞই সাত্ত্বিক যজ্ঞ। ১১

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! ফলের উদ্দেশ্যে ও দম্ভের সহিত অনুষ্ঠিত যজ্ঞকে রাজসী বলিয়া জানিবে। ১২

যাহার ভিতর বিধি নাই, অন্নের উৎপত্তি

নাই, মন্ত্র নাই, ত্যাগ নাই, শ্রদ্ধা নাই সেই যজ্ঞকে বুদ্ধিমান লোকে তামস যজ্ঞ বলে। ১৩

দেবতা ব্রাহ্মণ, গুরু ও জ্ঞানীর পূজা, পবিত্রতা, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা—এই সকলকে শারীরিক তপ কহে। ১৪

কাহারও দুঃখদায়ক না হয় এরূপ সত্য, প্রিয় হিতকর কথা বলা ও ধর্ম্মগ্রন্থের অভ্যাস করা—এ সকলকে বাচনিক তপ কহে। ১৫

চিত্তের প্রসন্নতা, সৌম্যতা, মৌন, আত্মসংযম, অন্তঃকরণশুদ্ধি—এগুলিকে মানসিক তপ কহে। ১৬

সমভাবী পুরুষ যখন ফলেচ্ছা ত্যাগ করিয়া পরম শ্রদ্ধাপূর্ব্বক এই তিন

প্রকারের তপ করে, তখন বুদ্ধিমান লোকে তাহাকে সাত্ত্বিক তপ কহে। ১৭

যাহা সংকার, মান এবং পূজার জন্য দম্ভপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হয়, ঐ অস্থির ও অনিশ্চিত তপকে রাজস তপ কহে। ১৮

যে তপ কষ্ট করিয়া, দুরাগ্রহ পূর্ব্বক অথবা অন্যের নাশের জন্য করা হয়, তাহাকে তামস তপ বলে। ১৯

দেওয়া উচিত এরূপ বুঝিয়া, প্রতিদানের আশা না রাখিয়া, দেশ, কাল এবং পাত্র বিবেচনা করিয়া যে দান করা হয় তাহাকে সাত্ত্বিক দান কহে। ২০

যে দান প্রতিদানের আশায়, অথবা ফল লক্ষ্য করিয়া এবং দুঃখের সহিত দেওয়া হয়, তাহাকে রাজস দান কহে। ২১

দেশ কাল এবং পাত্র বিচার না করিয়া, অসম্মান ও তিরস্কারের সহিত প্রদত্ত দানকে তামস দান কহে। ২২

ব্রহ্মের বর্ণন 'ওঁ তৎ সৎ' এই তিন প্রকারে করা গিয়াছে, এবং ইহা দ্বারা পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণ, বেদ এবং যজ্ঞ উৎপন্ন হইয়াছিল। ২৩

এ জন্য ব্রহ্মবাদী ওঁ উচ্চারণ করিয়া যজ্ঞ, দান ও তপরূপ ক্রিয়া সব সময় বিধিবৎ করিয়া থাকে। ২৪

আর মোক্ষেচ্ছু 'তৎ' উচ্চারণ করিয়া ফলের আশা না রাখিয়া যজ্ঞ, তপ এবং দানরূপ বিবিধ ক্রিয়া করিয়া থাকে। ২৫

সত্য ও কল্যাণের অর্থে সৎ শব্দের প্রয়োগ হয়। আর হে পার্থ! ভাল কাজ বুঝাইতেও সৎশব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ২৬

যজ্ঞ, তপ ও দানবিষয়ে দৃঢ়তাকেও সৎ কহে। তৎ এর (ভগবানের) নিমিত্ত যে কর্ম্ম করা হয় তাহা এবং এরূপ সংকল্পকেও সৎ কহে। ২৭

টিপ্পনী—উপরোক্ত তিন শ্লোকের ভাবার্থ এই যে, প্রত্যেক কর্ম্ম ঈশ্বরার্পণ করিয়াই করিবে, কারণ ওঁ-ই সৎ সত্য। উহাতে অর্পণকারী উর্দ্ধে গমন করে।

হে পার্থ! যে যজ্ঞ, দান, তপ অথবা অপর কার্য্য শ্রদ্ধা বিনা করা হয়, তাহাকে অসৎ কহে। তাহা ইহলোকের কাজেও আসে না, পরলোকের কাজেও আসে না। ২৮

ওঁ তৎ সৎ

এই প্রকারে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপ উপনিষদ অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যান্তর্গত যোগশাস্ত্রের শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ নামক সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

অষ্টাদশ অধ্যায়

সন্ন্যাসযোগ

এই অধ্যায় গীতার উপসংহার স্বরূপ। 'সব ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আমার শরণ লও' ইহাকে এই অধ্যায়ের অথবা গীতার মূলমন্ত্র কহা যায়। ইহাই প্রকৃত সন্ন্যাস। পরন্তু সব ধর্ম্মত্যাগের অর্থ সব কর্ম্ম ত্যাগ নহে। পরোপকারের কর্ম্মের মধ্যেও যে গুলি সর্ব্বোৎকৃষ্ট কর্ম্ম, সেগুলি তাঁহাকে অর্পণ করা এবং ফলেচ্ছা ত্যাগ করাই সর্ব্ব ধর্ম্ম ত্যাগ বা সন্ন্যাস।

অর্জ্জুন কহিলেন—

হে মহাবাহো! হে হৃষিকেশ! হে কেশীনিসূদন! সন্ন্যাস এবং ত্যাগের পৃথক পৃথক রহস্য আমি জানিতে ইচ্ছা করি। ১

শ্রীভগবান কহিলেন—

কাম্য (কামনা হইতে উৎপন্ন) কর্ম্মের ত্যাগকে জ্ঞানীরা সন্ন্যাস নামে জানে। সকল কর্ম্মের ফলত্যাগকে বিচক্ষণ লোকে ত্যাগ কহে। ২

অনেক বিচারশীল পুরুষ কহে—কর্ম্মমাত্র দোষযুক্ত বলিয়া ত্যাগযোগ্য; অপরে কহে—যজ্ঞ, দান আর তপরূপ কর্ম্ম ত্যাগযোগ্য নহে। ৩

হে ভরতসত্তম! এই ত্যাগের বিষয়ে আমার নির্ণয় শুন। হে পুরুষব্যাঘ্র! ত্যাগ তিন প্রকার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ৪

যজ্ঞ, দান আর তপরূপ কর্ম্ম ত্যজ্য নহে বরং অনুষ্ঠানযোগ্য। যজ্ঞ, দান আর তপ বিবেকীগণের চিত্তশুদ্ধিকর। ৫

হে পার্থ! এ সব কাজও আসক্তি এবং ফলেচ্ছা ত্যাগ করিয়া করা চাই, ইহাই আমার নিশ্চিত উত্তম মত। ৬

নিয়ত কর্ম্ম ত্যাগযোগ্য নহে। মোহের বশ হইয়া যদি কেহ তাহা ত্যাগ করে, তবে ঐ ত্যাগ তামস ত্যাগ বলিয়া গণ্য হয়। ৭

দুঃখকারক মনে করিয়া শারীরিক ক্লেশের ভয়ে যে কর্ম্ম ত্যাগ করা হয়, তাহা রাজস ত্যাগ, আর ইহা দ্বারা ত্যাগের ফল মিলে না। ৮

হে অর্জ্জুন! করা চাই, ইহা বুঝিয়া যে নিয়ত কর্ম্ম সঙ্গ এবং ফলত্যাগ করিয়া করা যায়, ঐ ত্যাগ সাত্ত্বিক ত্যাগ বলিয়া উক্ত হয়। ৯

সংশয়রহিত হইয়া, শুদ্ধচিত্ত ত্যাগী ও

বুদ্ধিমান লোকে অসুবিধাজনক কর্ম্মের দ্বেষ করে না, সুবিধাজনক কর্ম্মে লীন হয় না। ১০

কর্ম্মকে সর্ব্বথা ত্যাগ করা দেহধারীর পক্ষে সম্ভব নহে। পরন্তু যে কর্ম্মফল ত্যাগ করে, তাহাকেই ত্যাগী বলে। ১১

ত্যাগ যে করে নাই তাহার কর্ম্মফল পরলোকে তিন প্রকারের হয়—অশুভ, শুভ এবং শুভাশুভ। যে ত্যাগী (সন্ন্যাসী) তাহার কখনও হয় না। ১২

হে মহাবাহো! সাংখ্যশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে কর্ম্মমাত্রের সিদ্ধির পাঁচটী কারণ আছে। তাহা আমার নিকট জান। ১৩

ঐ পাঁচটি কারণ এই—ক্ষেত্র, কর্ত্তা, পৃথক পৃথক সাধন, ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া এবং পঞ্চম দৈব। ১৪

শরীর, বাক্য অথবা মন দ্বারা যে কোনো নীতিসম্মত অথবা নীতিবিরুদ্ধ কাজ মানুষ করুক না কেন তাহার এই পাঁচটি কারণ আছে। ১৫

এরূপ হওয়া সত্ত্বে অসংস্কৃত বুদ্ধিবশে যে নিজেকে কর্ত্তা মনে করে, সে দুর্ম্মতি কিছুই বোঝে না। ১৬

যাহার ভিতর অহঙ্কারভাব নাই, যাহার বুদ্ধি মলিন নহে, সে এই জগৎকে বিনাশ করিলেও বিনাশ করে না, সে বন্ধনেও আবদ্ধ হয় না। ১৭

টিপ্পনী—ভাসা ভাসা রকমে পড়িলে এই শ্লোক মানুষকে ভুলের মধ্যে ফেলিতে পারে। গীতার অনেক শ্লোক কাল্পনিক আদর্শ অবলম্বনকারী। তাহার হুবহু নমুনা জগতে মিলে না। প্রয়োগের

জন্য যেরূপ জ্যামিতিতে কাল্পনিক আদর্শ ক্ষেত্রের আবশ্যক আছে, ধর্ম্মানুষ্ঠানের জন্যও এরূপ আদর্শের আবশ্যক আছে। এ জন্য এ শ্লোকের অর্থ ইহা করা যাইতে পারে—যাহার অহংভাব ভস্ম হইয়া গিয়াছে এবং যাহার বুদ্ধিতে লেশমাত্র ময়লা নাই, সে সারা জগৎকে বিনাশ করিতে পারে। পরন্তু যার ভিতর অহংভাব নাই, তার শরীরও নাই। যার বুদ্ধি বিশুদ্ধ সে ত্রিকালদর্শী। এরূপ পুরুষ তো কেবল এক ভগবান। তিনি কর্ত্তা হইয়াও অকর্ত্তা; হত্যা করিয়াও অহিংসক। অতএব অহিংসা এবং শিষ্টাচার বা শাস্ত্রের পথই মানুষের এক মাত্র পথ।

জ্ঞান, জ্ঞেয় ও পরিজ্ঞাতা এই তিনটি কর্ম্মপ্রেরণার হেতু; ইন্দ্রিয়গণ, ক্রিয়া ও কর্ত্তা এই তিনটি কর্ম্মসংগ্রহ বা কর্ম্মের আশ্রয়। ১৮

টিপ্পনী—ইহাতে বিচার ও আচারের (চিন্তা ও কার্য্যের) সমন্বয় আছে। মানুষ প্রথমে কি করিবে (জ্ঞেয়) ও কিরূপে করিবে (জ্ঞান) তাহা জানিয়া পরিজ্ঞাতা হয়। এইরূপে কর্ম্মপ্রেরণা আসিলে সে ইন্দ্রিয় দ্বারা (করণ) ক্রিয়ার কর্ত্তা হয়। ইহা কর্ম্মসংগ্রহ।

জ্ঞান, কর্ম্ম এবং কর্ত্তা গুণভেদে তিন প্রকারের হয়। গুণহিসাবে তাহাদিগকে যেরূপে বর্ণনা করা যায় তাহা শুন। ১৯

যাহার দ্বারা মানুষ সমস্ত ভূতে একই অবিনাশী ভাবকে এবং বিবিধের মাঝে একত্বই দেখে, তাহাকে সাত্ত্বিক জ্ঞান বলিয়া জান। ২০

(দেখিতে) ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার জন্য সমস্ত প্রাণীতে যে জ্ঞানের দ্বারা মানুষ ভিন্ন

ভিন্ন বিভক্ত ভাবকে দেখে, ঐ জ্ঞানকে রাজস বলিয়া জান। ২১

যাহা দ্বারা বিনা কোনো কারণে একই কার্য্যে আসক্ত হইয়া লোকে ভাবে ইহাই সব, যাহা রহস্যরহিত ও তুচ্ছ, তাহাকে তামস জ্ঞান কহে। ২২

ফলেচ্ছারহিত পুরুষের আসক্তি ও রাগদ্বেষবিনা অনুষ্ঠিত নিয়ত কর্ম্মকে সাত্ত্বিক কর্ম্ম কহে। ২৩

টিপ্পনী—৩-৮এর টিপ্পনী দেখ।

ভোগের ইচ্ছা রাখিয়া 'আমি করিতেছি' এই ধারণাবশে কষ্ট পূর্ব্বক যাহা করা হয় সেই কর্ম্ম রাজসিক। ২৪

পরিণাম, হানি, হিংসা ও নিজের

সামর্থ্য বিচার না করিয়া মোহবশে মানুষ যে কর্ম্ম আরম্ভ করে, তাহা তামস কর্ম্ম। ২৫

যে ব্যক্তি আসক্তি ও অহঙ্কাররহিত, যাহার ভিতর দৃঢ়তা ও উৎসাহ আছে, সফলতা-নিষ্ফলতায় যে হর্ষ-শোক করে না, সে সাত্ত্বিক কর্ত্তা বলিয়া খ্যাত। ২৬

যে রাগী, যে কর্ম্মফল ইচ্ছা করে, যে লোভী, হিংসাবান, মলিন, হর্ষশোকযুক্ত, তাহাকে রাজস কর্ত্তা বলে। ২৭

যে অব্যবস্থিত, অসংস্কারী, উদ্ধত, শঠ, নীচ, অলস, অপ্রসন্নচিত্ত ও দীর্ঘসূত্রী তাহাকে তামস কর্ত্তা কহে। ২৮

হে ধনঞ্জয়! গুণ অনুসারে বুদ্ধি ও ধৃতির তিন প্রকার ভেদ আছে; আমি উহা

সম্যকরূপে পৃথক পৃথক কীর্ত্তন করিতেছি, তাহা শুন। ২৯

প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, কার্য্য অকার্য্য, ভয় অভয়, বন্ধ ও মোক্ষের ভেদ যে বুদ্ধিদ্বারা (ঠিকমত) জানা যায় তাহা সাত্ত্বিক বুদ্ধি। ৩০

হে পার্থ! যে বুদ্ধি দ্বারা ধর্ম্ম অধর্ম্ম, কার্য্য অকার্য্যের বিচার যথাযথভাবে করা যায় না তাহাই রাজসী বুদ্ধি। ৩১

হে পার্থ! যে বুদ্ধি অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া মনে করে এবং সকল জিনিষ উল্টাভাবে দেখে তাহা তামস বুদ্ধি। ৩১

হে পার্থ! যে একনিষ্ঠ ধৃতির দ্বারা মানুষ মন প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়ের কার্য্য

সাম্যবুদ্ধিতে ধারণ করে তাহা সাত্ত্বিকী ধৃতি। ৩৩

হে পার্থ! যে ধৃতির জন্য মানুষ ফলাকাঙ্খী হইয়া ধর্ম্ম, কাম এবং অর্থকে আসক্তিপূর্ব্বক ধারণ করে তাহা রাজসী ধৃতি। ৩৪

যে ধৃতির জন্য দুর্বুদ্ধি মানুষ নিদ্রা, ভয়, শোক, নিরাশা ও মদ ছাড়িতে পারে না, হে পার্থ! তাহা তামসী ধৃতি। ৩৫

হে ভরতর্ষভ! এখন তিন প্রকারের সুখের বর্ণনা আমার নিকট শুন। যাহার অভ্যাস বশে মানুষ প্রসন্ন থাকে, যাহা দ্বারা দুঃখ শেষ হয়, যাহা আরম্ভে বিষের ন্যায় কিন্তু পরিণামে অমৃত সমান, যাহা আত্ম-জ্ঞানের প্রসন্নতার ভিতর হইতে উৎপন্ন

হইয়া থাকে, তাহাকে সাত্ত্বিক সুখ বলে। ৩৬-৩৭

বিষয় ও ইন্দ্রিয়গণের সংযোগে উৎপন্ন যে-সুখ প্রথমে অমৃতসমান পরে বিষের ন্যায়—তাহাকে রাজস সুখ বলে। ৩৮

যাহা আরম্ভে ও পরিণামে আত্মাকে মোহাচ্ছন্ন করে, যাহা নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ হইতে উৎপন্ন তাহাকে তামস সুখ কহে। ৩৯

পৃথিবীতে অথবা দেবতাদের ভিতর স্বর্গেও এরূপ কিছু নাই, যাহা প্রকৃতিতে উৎপন্ন এই তিন গুণ হইতে মুক্ত। ৪০

হে পরন্তপ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের কর্ম্ম তাহাদের প্রকৃতিসিদ্ধ গুণানুসারে বিভাগ হইয়াছে। ৪১

শম, দম, তপ, শৌচ, ক্ষমা, সরলতা,

জ্ঞান, অনুভব, আস্তিকতা এ গুলি ব্রাহ্মণের প্রকৃতিসিদ্ধ কর্ম্ম। ৪২

শৌর্য্য, তেজ, ধৃতি, দক্ষতা, যুদ্ধে পিছে না হটা, দান, রাজ্যশাসন এ গুলি ক্ষত্রিয়ের প্রকৃতিসিদ্ধ কর্ম্ম। ৪৩

কৃষি, গোরক্ষা ব্যবসা এসব বৈশ্যের প্রকৃতিসিদ্ধ কর্ম্ম। আর শূদ্রের প্রকৃতিসিদ্ধ কর্ম্ম চাকরী। ৪৪

আপন আপন কর্ম্মে রত থাকিয়া মানুষ মোক্ষ পায়। স্বকর্ম্মরত মানুষ কিরূপে মোক্ষ পায় তাহা শুন। ৪৫

যাহার দ্বারা প্রাণীদের প্রবৃত্তি জন্মে এবং যাহার দ্বারা সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া আছে, তাহাকে যে পুরুষ স্বকর্ম্ম দ্বারা ভজনা করে সে মোক্ষ পায়। ৪৬

পরধর্ম্ম সুলভ হইলেও তাহা অপেক্ষা বিগুণ স্বধর্ম্ম অনেক ভাল। স্বভাবের অনুরূপ কর্ম্মকারী মানুষের পাপ হয় না। ৪৭

টিপ্পনী—স্বধর্ম্ম অর্থাৎ নিজের কর্ত্তব্য। গীতার শিক্ষার মধ্যবিন্দু কর্ম্মফলত্যাগ এবং স্বকর্ম্ম অপেক্ষা উত্তম কর্ত্তব্য খুঁজিলে ফলত্যাগের জন্য স্থান থাকে না, সে জন্য স্বধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। তাহা পালন করিলে সব ধর্ম্মের ফল পাওয়া যায়।

হে কৌন্তেয়! সদোষ হইলেও সহজ প্রাপ্ত কর্ম্ম ছাড়া ঠিক নহে। যেরূপ আগুনের সাথে ধোঁয়া থাকে, সেরূপ সব কাজের সহিত দোষ থাকে। ৪৮

যে ব্যক্তি সব স্থান হইতে আসক্তিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়াছে, যে কামনা ত্যাগ

করিয়াছে, যে মনকে জয় করিয়াছে, সে সন্ন্যাস দ্বারা নৈষ্কর্ম্মরূপ পরম সিদ্ধি পায়। ৪৯

হে কৌন্তেয়! সিদ্ধি পাওয়ার পর মানুষ কিরূপে ব্রহ্মকে পায়, তাহা আমার কাছে সংক্ষেপে শুন। ইহাই জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা। ৫০

যার বুদ্ধি শুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, এরূপ যোগী দৃঢ়তা পূর্ব্বক নিজেকে বশ করিয়া, শব্দাদি বিষয় সকল ত্যাগ করিয়া, রাগদ্বেষ জয় করিয়া, একান্তে বাস করিয়া, অল্পাহার করিয়া, বাক্য, শরীর ও মনকে সংযত রাখিয়া, ধ্যানযোগে নিত্যপরায়ণ হইয়া, বৈরাগ্যের আশ্রয় লইয়া, অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ ত্যাগ করিয়া,

মমতারহিত ও শান্ত হইয়া ব্রহ্মভাব পাইবার যোগ্য হয়। ৫১-৫২-৫৩

ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত প্রসন্নচিত্ত মানুষ শোক করে না, কিছু ইচ্ছা করে না; ভূতমাত্রে সমভাব রাখিয়া সে আমার পরম ভক্তি পায়। ৫৪

আমি কিরূপ ও কে ইহা সে ভক্তিদ্বারা যথার্থরূপে জানে, আর এরূপে আমাকে যথার্থরূপে জানিয়া আমাতে প্রবেশ করে। ৫৫

আমার আশ্রয়গ্রহণকারী সদা সব কর্ম্ম করিলেও আমার কৃপায় শাশ্বত অব্যয় পদ পায়। ৫৬

মন দ্বারা সব কর্ম্ম আমাতে অর্পণ করিয়া, আমাপরায়ণ হইয়া, বিবেকবুদ্ধির

আশ্রয় লইয়া নিরন্তর আমাতে চিত্ত স্থির কর। ৫৭

আমাতে চিত্তস্থাপন করিলে মুস্কিলের সমস্ত পাহাড় আমার কৃপায় পার হইবে, পরন্তু যদি অহঙ্কারের বশ হইয়া আমার কথা না শুন, তবে নাশ হইবে। ৫৮

অহঙ্কারের বশ হইয়া 'যুদ্ধ করিব না' এরূপ তুমি যদি মনে কর, তবে তোমার এই সংকল্প মিথ্যা। তোমার স্বভাবই তোমাকে ঐ দিকে বল প্রয়োগে টানিয়া লইয়া যাইবে। ৫৯

হে কৌন্তেয়! তুমি যাহা মোহের বশ হইয়া করিতে চাহিতেছ না, প্রকৃতিসিদ্ধ কর্ম্মদ্বারা বদ্ধ হইয়া, তাহা তোমাকে অবশ্য করিতে হইবে। ৬০

হে অর্জ্জুন! ঈশ্বর সব প্রাণীর হৃদয়ে বাস করেন এবং নিজ মায়ার প্রভাবে চাকের উপর চড়ান ঘড়ার ন্যায় তাহাদিগকে ঘুরপাক খাওয়ান। ৬১

হে ভারত! তুমি সর্ব্বভাবে তাঁহার শরণ লও। তাঁহার কৃপায় পরম শান্তিময় অমরপদ পাইবে। ৬২

এই গুহ্য হইতে গুহ্য জ্ঞান তোমাকে বলিলাম। এসব বিশেষ ভাবে বিচার করিয়া, তোমার যাহা ভাল লাগে তাহাই কর। ৬৩

আর সকলের অপেক্ষা গুহ্য আমার এরূপ পরম বচন শুন। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, এজন্য আমি তোমাকে তোমার হিত কথা কহিব। ৬৪

আমাতে চিত্ত সমর্পণ কর, আমার ভক্ত হও, আমার উদ্দেশে যজ্ঞ কর, আমার বন্দনা কর। তবে তুমি আমাকে পাইবে, তুমি আমার প্রিয়, সে জন্য ইহা তোমায় নিশ্চয় করিয়া কহিলাম। ৬৫

সকল ধর্ম্মত্যাগ করিয়া এক আমারই শরণ লও। আমি তোমাকে সব পাপ হইতে মুক্ত করিব। শোক করিও না। ৬৬

যে তপস্বী নহে, যে ভক্ত নহে, যে শুনিতে চায় না এবং যে আমার দ্বেষ করে, তাহাকে এই (জ্ঞান) তুমি কখনও কহিবে না। ৬৭

পরন্তু এই পরম গুহ্য জ্ঞান যে আমার ভক্তকে দিবে, আমার প্রতি পরম ভক্তির জন্য সে নিঃসন্দেহে আমাকেই পাইবে। ৬৮

তাহার অপেক্ষা মানুষের মধ্যে আমার কেহ অধিক প্রিয় সেবক নাই, আর এই পৃথিবীতে ভবিষ্যতে আর কেহই তাহার অপেক্ষা আমার অধিক প্রিয় হইবে না। ৬৯

আমার এই ধর্ম্মসংবাদ যে অভ্যাস করিবে, সে জ্ঞানযজ্ঞদ্বারা আমার ভজনা করিবে, এরূপ আমার মত। ৭০

আর যে ব্যক্তি দ্বেষরহিত হইয়া শ্রদ্ধাপুর্ব্বক শুধু শুনিবে, সেও মুক্ত হইয়া পুণ্যবান যথায় বাস করে সেই শুভলোক প্রাপ্ত হইবে। ৭১

টিপ্পনী—ইহার তাৎপর্য্য এই, যে ব্যক্তি এই জ্ঞান অনুভব করিয়াছে, সেই ইহা অপরকে দিতে পারে। শুদ্ধ উচ্চারণ করিয়া অর্থ সহিত যে শুনায় এই দুই শ্লোক তাহার সম্বন্ধে খাটে না।

হে পার্থ! ইহা তুমি একাগ্রচিত্তে শুনিয়াছ? হে ধনঞ্জয়! অজ্ঞান হেতু তোমার যে মোহ হইয়াছিল, তাহা কি নষ্ট হইয়াছে? ৭২

অর্জ্জুন কহিলেন—

হে অচ্যুত! তোমার কৃপায় আমার মোহ নাশ হইয়াছে। আমার হুঁস হইয়াছে, শঙ্কার সমাধান হইয়াছে বলিয়া আমি স্বস্থ (কর্ত্তব্য ধর্ম্মের স্মৃতি লাভ করিয়াছি) হইয়াছি। তোমার কথামত চলিব। ৭৩

সঞ্জয় কহিলেন—

এই প্রকার বাসুদেব আর মহাত্মা পার্থের এই রোমাঞ্চকর এরূপ অদ্ভুত সংবাদ আমি শুনিয়াছি। ৭৪

ব্যাসদেবের কৃপায় যোগেশ্বর কৃষ্ণের শ্রীমুখ হইতে আমি এই গুহ্য পরমযোগ শুনিয়াছি। ৭৫

হে রাজন! কেশব আর অর্জ্জুনের এই অদ্ভুত এবং পবিত্র সংবাদ স্মরণ করিয়া, আমি বারংবার আনন্দিত হইতেছি। ৭৬

হে রাজন! হরির ঐ অদ্ভুত রূপ স্মরণ করিতে করিতে আমি মহা বিস্মিত এবং বারংবার আনন্দিত হইতেছি। ৭৭

যেখানে যোগেশ্বর কৃষ্ণ ও ধনুর্দ্ধারী পার্থ রহিয়াছেন, সেখানে রাজশ্রী, বিজয়, বৈভব ও অবিচল নীতি থাকিবে ইহাই স্থির বুঝিয়াছি। ৭৮

টিপ্পনী—যোগেশ্বর কৃষ্ণ অর্থাৎ অনুভবসিদ্ধ শুদ্ধ জ্ঞান, এবং ধনুর্দ্ধারী অর্জ্জুন অর্থাৎ তদনুসারিনী

ক্রিয়া। এই দুইএর মিলন যেখানে হয়, সেখানে সঞ্জয় যেরূপ বলিলেন, তাহা ছাড়া আর কি পরিণাম হইতে পারে ?

ওঁ তৎ সৎ

এই প্রকারে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপ উপনিষদ অর্থাৎ ব্রহ্মবিদ্যান্তর্গত যোগশাস্ত্রের শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে সন্ন্যাসযোগ নামক অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত হইল।

ওঁ শান্তিঃ

বিনয়কৃষ্ণ সেন সঙ্কলিত ও প্রণীত

গ্রন্থাবলী

মহাত্মা গান্ধী লিখিত

দুর্নীতির পথে ।৶০

জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া গান্ধীজী যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন তাহাই এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে যাঁহারা ভাবেন তাঁহারা ইহাতে যথেষ্ট চিন্তার খোরাক পাইবেন। পুস্তকের পরিশিষ্টে পাশ্চাত্যের কয়েকজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকের প্রবন্ধের অনুবাদ আছে।

ব্রহ্মচর্য্য ॥০

দ্বিতীয় সংস্করণ। মহাত্মা গান্ধী নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে যে সকল সত্য লাভ করিয়াছেন, এই পুস্তকে তাহা স্পষ্ট ও সরলভাবে বিবৃত হইয়াছে। আমরা বাংলার যুবকগণকে এই পুস্তক পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

প্রবাসী—ভাষা সুন্দর ও সুবোধ্য। পুস্তকটী অতিশয় চিন্তাকর্ষক ও বহুপ্রচারযোগ্য। পুস্তকের ছাপা ও কাগজ সুন্দর।

মহাত্মা গান্ধী লিখিত

অস্পৃশ্যের মুক্তি ৸০

মহাত্মাজী অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে যে সব আলোচনা করিয়াছেন তাহারই বাংলা অনুবাদ। ইহা যুগদেবতার বাণী—তাঁহার বজ্রকঠিন আদেশমন্ত্র।

প্রবাসী—এই পুস্তক প্রকাশ করিয়া বিনয়বাবু বাংলা দেশের উপকার করিয়াছেন।

বিধবা-বিবাহ ৵১০

বিধবাদের দুঃখমোচন জন্য যাঁহারা চিন্তা করিতেছেন এই সারবান যুক্তিপূর্ণ পুস্তক তাঁহাদের পাঠ করা কর্ত্তব্য।—প্রবাসী।

মহাত্মাজীর গীতাভাষ্য

অনাসক্তি যোগ

(মূল গুজরাতী হইতে অনূদিত)

মূল্য—বাঁধা—।৵০, অবাঁধা—।০

বিনয়কৃষ্ণ সেন প্রণীত

সুইজারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা ৸৹

পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ। মনোজ্ঞ-গল্পে সুইস স্বাধীনতার কথা। ছাপা ও বাঁধা সুন্দর।

প্রবাসী - ভাষা বেশ সরল। দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের যুগে এই জাতীয় পুস্তকের বিশেষ প্রয়োজন আছে।

বাংলার কথা—ভাষা সহজ, সরল, বর্ণনাভঙ্গীও বেশ। পাঠে লাঞ্ছিত উৎপীড়িত জাতির দুঃখে স্বভাবতঃই সহানুভূতি জাগিবে ও স্বাধীনতাস্পৃহা প্রবল হইয়া উঠিবে।

বিপ্লবের আহুতি ১৲

বিপ্লববাদীদের উপর রুশগভর্ণমেণ্টের ভীষণ অত্যাচারের করুণকাহিনী। স্বাধীনতার উপাসকদের কত রকম নির্য্যাতন সহিতে হয় তাহার হৃদয়বিদারক পরিচয়।

প্রবাসী—আমাদের দেশাত্মবোধক গ্রন্থমালায় বইখানি বিশেষ স্থান অধিকার করিবে। ছাপা ও বাঁধাই সুন্দর।

বিনয়কৃষ্ণ সেন প্রণীত

হিন্দুসংগঠন ১৲

সংখ্যায় বহু, ধন-সম্পদ-বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞান-বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ হইয়াও হিন্দু কেন বর্ব্বর আরব, তুর্কী, পাঠান, মোগল দস্যু-দলের চরণে স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়াছিল; কিরূপে নিরাশার ঘন-অন্ধকারের ভিতর শিবাজী গুরুগোবিন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষ মৃতপ্রায় হিন্দুজাতিকে উদ্বুদ্ধ ও শক্তিশালী করিয়াছিলেন; কিরূপে হিন্দুকে শুদ্ধি-সংগঠনের সাহায্যে আবার জগতে আত্মপ্রতিষ্ঠালাভ করিতে হইবে তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ইহাতে পাইবেন।

প্রবাসী—আলোচ্য পুস্তকখানিতে গ্রন্থকার চিন্তাশীলতা গবেষণা ও দেশাত্মবোধের পরিচয় দিয়াছেন।

বাল্যবিবাহনিরোধ আইন ।০

সহজ সরল বাংলায় বাল্যবিবাহনিরোধ আইনের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা। হিন্দু-মুসলমান নেতাদের মতামত সম্বলিত এবং বহু প্রয়োজনীয় তথ্যপূর্ণ।